নজরুল সাহিত্যে বিপ্লবের স্বরূপ

গাজী মোঃ রায়হান

400640

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

নভেম্বর ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

400640

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন-পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, গাজী মোঃ রায়হান কর্তৃক উপস্থাপিত 'নজরুল সাহিত্যে বিপ্লবের স্বরূপ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেন নি।

২১.১১.০২.

(ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ)

গবেষণা- তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক, বাংলা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০

বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

অনুবন্ধ

নজরুল সাহিত্যে বিপ্লবের স্বরূপ শীর্ষক বর্তমান অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষে নিবন্ধনকৃত গবেষক হিসেবে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপনের লক্ষ্যে রচিত। প্রথমে আমি নজরুল সাহিত্যে বিপ্লবের স্বরূপ শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনার অভিপ্রায় এবং প্রস্তুতি নিয়ে ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষে অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের তত্ত্বাবধানে এম.ফিল কোর্সে ভর্তি হই। প্রথম পর্বের পরীক্ষায় সাফল্যজনকভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার পর যথানিয়মে আমি আমার নির্ধারিত শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ শুরু করি। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী ও বিপ্লবী কবি হিসেবে পরিচিত। তাঁর রচিত সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে তাঁর বিপ্লবী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। নজরুলের বিপ্লবী মানসিকতার প্রসঙ্গ কোনো কোনো লেখকের রচনায় খণ্ডিতভাবে পাওয়া গেলেও তাঁর বিপ্লবের স্বরূপ নির্ণয়ের লক্ষ্যে রচিত স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন গবেষণাগ্রন্থ এ যাবত পরিদৃষ্ট হয়নি। সে বিষয়টি অনুধাবন করে নজরুল সাহিত্যে বিপ্লবের স্বরূপ শিরোনামে এ গবেষণা কাজের পরিকল্পনা করা হয়।

এ অভিসন্দর্ভটি রচনার লক্ষ্যে নজরুল সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে উদ্দিষ্ট কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, অভিভাষণ ও চিঠিপত্র অধ্যয়ন ও নির্বাচন ছিলো এক শ্রম ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এগুলোর অনুপুঙ্খ অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করে নজরুল সাহিত্যে বিপ্লবের স্বরূপ সন্ধানের প্রয়াস পাওয়া গেছে। বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে প্রচুর সহায়ক গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা এবং সাময়িকীরও প্রয়োজন হয়েছিলো। অভিসন্দর্ভটি রচনার প্রয়োজনে যেসব ইংরেজি-বাংলা গ্রন্থের সাহায্য গৃহীত হয়েছে গ্রন্থপঞ্জিতে সবগুলোরই উল্লেখের সযত্ন প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এ অভিসন্দর্ভে বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বানান-অভিধান অনুসৃত হয়েছে। তবুও কম্পিউটার মুদ্রণের সময় প্রযুক্তিগত ও অনবধানবশত কিছু মুদ্রণ-ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

400640

এ গবেষণাকালে আমার প্রধান প্রধান অনুসন্ধান ক্ষেত্র ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরি, নজরুল ইন্সটিটিউট লাইব্রেরি এবং বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার। এ ব্যাপারে সকলের কাছে আমি ঋণস্বীকার করছি। গ্রন্থাগারগুলোর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহযোগিতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ মনোভাব প্রশংসার্হ। এজন্য তাঁদেরকে কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এ অভিসন্দর্ভ রচনার সূত্রপাত এবং সম্পন্ন করার দীর্ঘ পথপরিক্রমায় প্রতিনিয়ত প্রেরণা, উৎসাহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ পথনির্দেশনা দিয়েছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ। তাঁর অপরিসীম ধৈর্য, অসীম স্নেহ এবং গবেষণা সমাপ্তির লক্ষ্যে অর্থবহ নির্দেশনাসহ নিরন্তর তাগিদ অভীষ্টে উপনীত হতে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। তাঁর কাছে এ ঋণ চিরকাল অপরিশোধ্য। এ অভিসন্দর্ভ মুদ্রণে বন্ধুবর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন এবং মোঃ বেলায়েত হোসেনের ঐকান্তিক সহযোগিতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। সম্পূর্ণ গবেষণাকালে আমার স্ত্রী রোকসানা আক্তারের ঐকান্তিক আগ্রহে সাংসারিক সার্বিক দায়িত্ব একক প্রচেষ্টায় সম্পাদন এ

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে এক বৃহৎ প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করেছে। তাঁর সার্বক্ষণিক উৎসাহ প্রদান এবং গৃহে গবেষণার যথোপযুক্ত পরিবেশ রচনায় সযত্ন পরিচর্যা যথাসময়ে কাজ শেষ করার ক্ষেত্রে ছিলো অত্যন্ত সহায়ক। আব্বা গাজী আব্দুল খালেক এবং আম্মা আক্তার বেগমের অশেষ স্নেহ, দোয়া এবং বরাভয় প্রদান আমার শ্রমকষ্ট ও উৎকণ্ঠা দূর করেছে। এঁদের সকলের এবং সর্বোপরি অনেক বন্ধু-বান্ধব, শুভানুধ্যায়ী এবং আমার পরিবারবর্গের অন্যান্য সদস্যের ভূমিকা, প্রেরণা এবং অবদানও চিরস্মরণীয়। উপর্যুক্ত সকলের সহযোগিতার সমন্বিত শক্তি চারপাশে বিদ্যমান পরিবেশের মধ্যে গবেষণা ও অভিসন্দর্ভ রচনার মতো দুরূহ কর্মসম্পাদনের সময় আমাকে প্রতিনিয়ত উদ্দীপিত রেখেছে। এজন্যই সকল শ্রম, ঘর্ম ও বিঘ্ন হয়ে উঠেছিলো সুসহ এবং অনায়াস।

গাজী মোঃ রায়হান

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	:	ভূমিকা	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	বিপ্লবের বিভিন্ন ধারিক ব্যাখ্যা	৪
তৃতীয় অধ্যায়	:	ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ	৮
চতুর্থ অধ্যায়	:	সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় বিভেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ	৫১
পঞ্চম অধ্যায়	:	নারীর অধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ	৭০
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ	৮৪
সপ্তম অধ্যায়	:	অমানবিক সমাজব্যবস্থা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ	১০২
উপসংহার	:		১২২
গ্রন্থপঞ্জি	:		১২৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম একজন ব্যতিক্রমধর্মী কবি। তিনি ছিলেন চেতনার দীপ্রতায় অপার অন্তহীনতায় উদ্বেল উর্মিমুখর নিসর্গে নিরন্তর সপ্রতিভ। মহাকবি আলাওলের সেই উক্তি 'কদাচিৎ কবি নহে সামান্য মনুষ্য' কবি নজরুলের ক্ষেত্রে যথার্থভাবেই সত্য। তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছিল অভিমানের সুর, দ্রোহের অবতারণা, বিরহের ব্যঞ্জনা আর বেদনার বৈভবে প্রেমিক মানবের উন্মাদনা।

নজরুল বিদ্রোহী কবি, বিপ্লবী কবি। তিনি বিদ্রোহ করেছেন, বিপ্লবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন সর্ব প্রকার অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে। তিনি যেমন সমাজে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর বিপ্লবী বাণী উচ্চারণ করেছেন তেমনি তৎকালীন ব্রিটিশ রাজশক্তির অন্যায়ের বিরুদ্ধেও সমানভাবে সোচ্চার হয়েছেন। নজরুল অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে সর্বদা প্রতিবাদ জানিয়েছেন মানুষের কল্যাণ কামনা করে। মানুষ সর্ব প্রকার অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভ করুক এটাই ছিল তাঁর প্রধান ধ্যান ও খেয়াল। মানুষকে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছেন তিনি। এদিক থেকে নজরুল মানবতাবাদী কবি।

নজরুলের পূর্ববর্তী কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছেন। সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং সাধারণ মানুষকে তাঁর সৃষ্টিকর্মে স্থান দিয়েছেন। তিনিও মানুষে মানুষে ভেদাভেদের বিরুদ্ধে, ধর্মীয় বিভেদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। কিন্তু মানব সমাজকে অন্যায়মুক্ত করার জন্য তিনি সোচ্চার হতে পারেন নি। কিন্তু নজরুল এক্ষেত্রে সোচ্চার কণ্ঠে হাতে রণ-তূর্য ধারণ করে সাহিত্যের অঙ্গনে আবির্ভূত হন। তিনি রচনা করেন বিপ্লবী সাহিত্য। নজরুলের মানস প্রবণতার এই বিপ্লবী দিকটি সবাইকে অধিক আকর্ষণ করে এবং একারণে এ অভিসন্দর্ভে তাঁর বিপ্লবী চেতনার স্বরূপ অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটি 'তথ্য বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও তুলনামূলক আলোচনা পদ্ধতি'-তে সম্পাদন করা হয়েছে। এজন্য গবেষণা কর্ম নিম্নোক্তভাবে সাজাবার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকায় গবেষণার বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাতের মাধ্যমে মূল বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিপ্লব সম্পর্কে আলোকপাত করতে যেয়ে বিপ্লবের বিভিন্নধারিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে- যা নজরুল সাহিত্যের বিপ্লবের স্বরূপ নির্ধারণের জন্য প্রায় অবধারিত বলা যেতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নজরুলের বিপ্লবী ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। শত শত বছরের শোষণ আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে অগ্নি-বাণী উচ্চারণের মধ্য দিয়ে নজরুল ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা এবং ভবিষ্যতের প্রচণ্ড আশাবাদই তাঁর রচিত সাহিত্যের মূল বিষয়বস্তু হিসেবে গৃহীত। তাঁর এই আশাবাদের পেছনে সক্রিয় ছিল অশুভ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অনিবার্য পতনে দৃঢ় প্রত্যয় এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। মাতৃভূমির মুক্তির

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্যে তিনি এদেশের বিপ্লবী সন্তানদের প্রতি তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। স্বদেশের মুক্তি কামনায় তৎপর নজরুল কেবলমাত্র সাহিত্যের মাধ্যমেই প্রতিবাদী হননি; বিভিন্ন আন্দোলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণও করেছেন। তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের সঙ্গে এখানেই তাঁর পার্থক্য। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায়ও স্বদেশপ্রেমের পরিচয় আছে, কিন্তু নজরুলই একমাত্র কবি যিনি লেখনীর মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীকে ভারতবর্ষে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তিত করে তুলেছিলেন। তিনি স্বাধীনতার কথা উচ্চকণ্ঠে সরাসরি ঘোষণা করেছেন। অন্যায়কারী ব্রিটিশ রাজশক্তির বিতাড়ন কামনায় নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গিগত দিক এ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় বিভেদের বিরুদ্ধে নজরুলের মনোভাবের প্রকৃতি তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর সচেতন মানসলোকে স্পষ্টতঃ উপলব্ধ হয়েছিল যে, রক্ষণশীলতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প সমাজ মানসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তিনি ধর্মীয় বিভেদে কলুষিত মানব হৃদয়ে অসাম্প্রদায়িক চিন্তার বীজ বপনে উদ্যোগী হয়েছেন। ধর্ম মানুষের বিবেকী আচরণের ওপর গুরুত্ব দেয়। ধর্ম চর্চার মাধ্যমে মানুষ বিবেকবান হবে, অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে এটাই কাম্য। কিন্তু নজরুল ধর্মকে উপলক্ষ করে সমাজের মানুষকে অবিবেচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখেছেন, ধর্ম নিয়ে সংঘাতে লিপ্ত মানুষের কদর্য রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। ধর্ম নিয়ে মানুষে মানুষে এ বিভেদ নজরুলের হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। তাই তিনি সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিকে আঘাত করেছেন ধর্ম ও যুক্তির সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে। ধর্মের উদার ব্যাখ্যায় নজরুল সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে আলোকিত মানুষে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন। একারণে বিভিন্ন ধর্মের পুরুষোত্তমদের একাসনে বসিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রতি সর্বদাই বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলেন। কিন্তু নজরুলের ন্যায় তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে তাঁরা এই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে আঘাত করতে পারেননি। মানুষের হৃদয় তথা মানুষকে নজরুল সর্বোচ্চে আসন দিয়েছেন। মানুষকে সবার ওপরে স্থান দেয়ার এই যে চিন্তাধারা তা ছিল সময়ের বিবেচনায় অভিনব। তাঁর এ অভিনব চিন্তাধারা বাংলা সাহিত্যে এক বৈপ্লবিক আদর্শের উদ্ভাবন হিসেবে পরিগণিত। ধর্মীয় বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেই মানুষে মানুষে ঐক্য রচিত হোক— এটাই ছিল তাঁর আন্তরিক কামনা। ধর্ম নিয়ে বিভেদের বিরুদ্ধে নজরুলের সোচ্চার ভূমিকার প্রসঙ্গই উপস্থাপিত হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়ে নারীর অধীনতার বিরুদ্ধে নজরুলের ঘৃণা ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের স্বরূপ উন্মোচনের দিকটি প্রাধান্য প্রাপ্ত। তিনি সমাজে নারীকে অবহেলিত, বঞ্চিত দেখে মর্মাহত হন এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন। পাশ্চাত্যে সর্ব প্রথম নারীর অধিকারের প্রশ্নে সাহিত্যিক সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে প্রাচ্যে নারীর অধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় আসে। নারীমুক্তি আন্দোলন ধারাবাহিকভাবে নজরুলে এসে পরিপূর্ণ সার্থকতা পায়। পূর্ববর্তীদের দ্বারা নারীর অধিকারের বিষয়টি সোচ্চার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়নি, যা হয়েছে নজরুলের কণ্ঠে। সমাজে নারীর দুর্দশা দেখে নজরুল বিচলিত হয়েছেন এবং বেদনায় আহত হয়েছেন। সমাজসচেতন নজরুল এর প্রতিকার সাধনে তৎপর হয়ে উঠেছেন। সমাজের এক অপরিহার্য অংশ নারীকে বাদ দিয়ে মানব সমাজের অগ্রগতি পূর্ণ সফলতা পেতে পারে না— এটা ঐতিহাসিকভাবে যেমন সত্য তেমনি নজরুলেরও হৃদয়গত সত্য। এ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি নারীর ন্যায্য অধিকারের পক্ষে তাঁর লেখনী চালনা করেছেন এবং সমস্যা সমাধানের জন্য জনসচেতনতা গড়ে

Dhaka University Institutional Repository

তুলতে চেয়েছেন। নারীর অধিকারের পক্ষে নজরুলের চিন্তা-ভাবনা ও উপলব্ধির সোচ্চার প্রকাশই এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে শোষণের বিরুদ্ধে নজরুলের প্রতিবাদের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে শাসকগোষ্ঠী যেমন নানাভাবে এদেশকে শোষণ করে, তেমনি এদেশের মানুষ শোষিত হয় দালাল, মহাজন, ধর্ম ব্যবসায়ীসহ অন্যান্য সুবিধাবাদীদের দ্বারা। অর্থনৈতিকসহ সর্ব প্রকার শোষণের কুৎসিত চেহারা নজরুল প্রত্যক্ষ করেন তাঁর সমাজে। রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশীদাররাও এসব শোষণকারীদের সঙ্গে শোষণকার্যে লিপ্ত থাকে। শাসকগোষ্ঠীর মদদে এসব শোষকগোষ্ঠীর দৌরাত্ম্য প্রাবল্য লাভ করে। ফলে সাধারণ অসহায় মানুষের প্রতিকার লাভের কোন পথ খোলা ছিল না। এসব অসহায় শ্রমজীবী মানুষের বেদনাকে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও উপলব্ধি করেছেন, ধনী-নির্ধনের বৈষম্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে দ্রষ্টার দৃষ্টি থাকলেও গভীরতার অভাব ছিল। ফলে তাঁর কাব্যে নিগৃহীত মানুষের দাবির কথা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারিত হয়নি। এক্ষেত্রে নজরুল প্রকৃতই ব্যতিক্রম। তিনি কুলি, মজুর, কৃষক, জেলে ইত্যাদি শ্রমজীবী মানুষের বেদনাকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাই শোষিত, বঞ্চিত জনগণের অধিকার আদায়ের প্রশ্নে তিনি হয়ে ওঠেন সংগ্রামী ও গণমানবশক্তিতে বিশ্বাসী। ফলে দুর্বল, ভীত, শোষিত মানুষের আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটাতে চেয়েছেন। কারণ দুর্বল, আত্মশক্তিহীন মানুষই শাসন ও শোষণের ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখে। এরই বাস্তবতা স্বরূপ নজরুল প্রত্যক্ষ করেন যে, শোষণ ও বঞ্চনার ফলে একটি শ্রেণী সব সুযোগ সুবিধা কুক্ষিগত করেছে আর একটি শ্রেণী অহর্নিশ বঞ্চিত হয়ে এ বঞ্চনাই তাদের পাওনা বলে জেনেছে। নজরুল তাই অন্যায়ের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এ সমাজ-সংসারকে ভেঙে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার জন্য বিপ্লবী সুর বাজিয়েছেন তাঁর সাহিত্যে। শোষণের বিরুদ্ধে বিপ্লবী নজরুলের প্রতিবাদী ভূমিকাই ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের নৈরাজ্য, অস্থিরতা আর হাহাকারে নিপতিত সমাজে নজরুল অবাধে নানা প্রকার অমানবিক ও অন্যায়মূলক কার্যকলাপ চলতে দেখেছেন। অশিক্ষা, অজ্ঞানতা, ধর্মান্ধতা, মূল্যবোধের অবক্ষয় আর ইংরেজ সরকারের বিমাতা সুলভ মনোভাবের কারণে সমাজ অচলায়তনের নিগড়ে পরিণত হয়। সেখানে সবলের দ্বারা দুর্বলের ওপর অত্যাচার চলেছে, নারী তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষের মধ্যে উত্তম-অধমের ব্যবধান সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া অশিক্ষা, অজ্ঞানতার কারণে এবং ধর্মব্যবসার পুরুষানুক্রমিক শোষণে এদেশের মানুষ ছিল কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। তারা শুভ-অশুভের ব্যবধান নির্ণয় করতে অপারগ বিধায় তাদের জীবন ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যার বেড়াজালে বিজড়িত। কূপমণ্ডুকতাকে ছাড়িয়ে উঠতে না পারার কারণে তারা তাদের জীবন সমস্যার সমাধান সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ। তাদেরকে প্রগতির পথে চালিত করার অবিচলিত সাহসিকতা ও মানসিকতা নিয়েই নজরুল সাহিত্যের মাধ্যমে তাদেরকে দিক নির্দেশনা দেন। সমাজের মানুষকে প্রত্যক্ষ ইঙ্গিতে দেখিয়ে দেন সমাজের অসংগতিগুলোকে। দুর্বল মানুষ আত্মশক্তি বৃদ্ধি করবে কর্মপ্রচেষ্টায়, উন্নত চিত্ত ও মনুষ্যত্বের সমন্বয়ে সে হবে কুসংস্কারমুক্ত আলোকিত মানুষ এবং সমাজব্যবস্থা হবে কল্যাণমূলক— এ প্রত্যাশায় নজরুল যে সমাধান-সূত্র রচনা করেছেন সপ্তম অধ্যায়ে তার আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

পরিশেষে উপসংহারে গবেষণা কর্মের সারবত্তা নিরূপণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিপ্লবের বিভিন্নধারিক ব্যাখ্যা

বিপ্লব এর অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণ বা আমূল পরিবর্তন। অন্যভাবে বলা যায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন অথবা আন্দোলন। অভিধানের অর্থানুযায়ী বিপ্লব হচ্ছে প্রধানতঃ শাসনতন্ত্রের ব্যাপক পরিবর্তন। কিন্তু বিপ্লব শব্দটাকে কেবল শাসনতন্ত্রের প্রসঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা যাবেনা। এটা আরও বহু বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বিপ্লবের স্বরূপ আচরণগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিরূপিত হয়। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্লবের অর্থ করেছেন নাশ, উপদ্রব, অত্যাচার, রাষ্ট্রোপদ্রব, অরাজকতা, উচ্ছেদ, উৎসাদ, বিধ্বংস, ব্যতিক্রম, উল্লঙ্ঘন, উপপ্লব ইত্যাদি।[১]

'বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান'-এ বিপ্লব শব্দের অর্থে দেশের শাসনব্যবস্থা বা সমাজ-ব্যবস্থায় দ্রুত ও আমূল পরিবর্তন নির্দেশিত। এই অভিধানে বিপ্লবের অন্য অর্থ হল বিদ্রোহ, উপদ্রব, ব্যাপক ধ্বংস বা বিনাশ।[২]

'ছাত্রবোধ অভিধান' অনুযায়ী বিপ্লব অর্থ বিদ্রোহ, উপদ্রব, বিবাদ, দেশ-লুণ্ঠন, বিনাশ, ভয়প্রদর্শন ইত্যাদি। এখানে বিপ্লবের অপর অর্থ হচ্ছে ভঙ্গি বা রব দ্বারা শত্রুকে ভয় প্রদর্শন করা। বিপ্লবকে এখানে হঠযুদ্ধ হিসেবেও অর্থ করা হয়েছে।[৩]

The Encyclopedia Americana থেকে এ সম্পর্কে যা পাওয়া যায় তা এরূপ, "REVOLUTION, a term used to designate a fundamental change in the government or the political constitution of a country, mainly brought about by internal causes and effected by violence and force of arms on the part of a considerable number of individuals.

... a revolution is sometimes defined as a struggle, more or less successfully and completely accomplished, in which the ruling power of a country passes from one economic class or political group to another class or group."[৪]

উপরিউক্ত তথ্য থেকে বোঝা যায় যে বিপ্লব শব্দটার দ্বারা কোন কর্তৃত্বের রদবদল বা বিদ্যমান অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। এ রদবদল হবে বিদ্যমান অবস্থার অপসারণকল্পে এবং মঙ্গল ও উন্নতির অভিপ্রায়ে।

সালাহউদ্দীন আইয়ুব তাঁর 'আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতা' গ্রন্থে বলেছেন, 'বিপ্লব একটা রাজনৈতিক পালাবদল: একটা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং আরেকটা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ উদ্ভব— এই হলো বিপ্লব।'[৫] কিন্তু একথার দ্বারা বিপ্লব শব্দের পরিসরকে সংকুচিত করা হয়েছে। কারণ একে কেবল রাজনৈতিক পরিবেশে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। আমরা ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, সবুজ বিপ্লব, অর্থনৈতিক বিপ্লব, সমাজ বিপ্লব, শিল্প বিপ্লব, সাংস্কৃতিক বিপ্লব (মাও সে তুং-এর) এর কথা জানি। বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য দুটি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত, বিপ্লব গতানুগতিক প্রথার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন করে নতুন চরিত্র আনয়ন করে।

দ্বিতীয়ত, বিপ্লব দ্রুততার সাথে ঘটে।

বিপ্লবের নির্দিষ্ট অর্থ ও সূচনা আছে। বিপ্লব স্থায়ী কোনো প্রক্রিয়া নয়, সময়ের প্রয়োজনে এর উত্থান ঘটে এবং প্রয়োজন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। বিপ্লবের প্রকৃত ধরণ দৃঢ়তা এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে তার অভিযাত্রা। লক্ষ্য ছাড়া বিপ্লব হয়না বলেই বিপ্লব নির্দিষ্ট। বিপ্লবের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদ্যমান অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন।

বিপ্লব বিভিন্ন উপায়ে সংঘটিত হতে পারে। একজন রাজনীতিবিদ বক্তৃতা, বিবৃতির মাধ্যমে বিপ্লব ঘটাতে পারেন। চিত্রকর চিত্রের মাধ্যমে বিপ্লব ঘটাতে পারেন। সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যকৃতির মাধ্যমে বিপ্লব ঘটাতে পারেন। বিপ্লব করেন যিনি বা বিপ্লব সংঘটনে চেষ্টিত বা ইচ্ছুক যিনি তিনিই বিপ্লবী।[৬]

বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী ও বিপ্লবী কবি হিসেবে কাজী নজরুল ইসলাম পরিচিত। কবি জীবনের শুরু থেকে শেষ অবধি মনে-প্রাণে সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে বিপ্লব ও বিদ্রোহের বাণী প্রকাশ করেছেন। বিপ্লব আর বিদ্রোহ ব্যতীত স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জন অসম্ভব— এরূপ ধারণা নজরুলের জীবন-দর্শনের অন্তর্গত। 'অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙার গান', 'প্রলয়-শিখা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে কবি বার বার প্রলয়ের দেবতাকে আহবান জানিয়েছেন।

নজরুল তাঁর কাব্যের সর্বত্র বন্ধন ও অধীনতাকে অস্বীকার করে অবাধ স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। জীবন ও জগতের সর্বক্ষেত্রেই তিনি 'পদ্ধতির শিকল' ভাঙতে চেয়েছেন।

ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে নজরুল একমাত্র কবি যিনি রাজনৈতিক কারণে কারারুদ্ধ হন এবং নির্যাতন ভোগ করেন। সঙ্গত কারণেই তাঁর জীবন ও চরিত্র, দৃষ্টি ও সৃষ্টি বাংলা কবিতার প্রচলিত ধারা থেকে স্বতন্ত্র হবে— এটাই স্বাভাবিক। বাংলা কবিতায় নজরুল নব সুর যোজনা করেছেন, নতুন সুর ঘোষণা করেছেন। বাংলা কবিতার অঙ্গনে তিনি যে বিষয় উপস্থাপন করেছেন তা প্রথাবিমুখ, সময়ের বিবেচনায় একেবারে নতুন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নজরুলের প্রধান যে কৃতিত্ব তা হচ্ছে রবীন্দ্র- প্রভাবমুক্ত আধুনিক কবিতার বলয় সৃষ্টি। অন্যভাবে বলা যায় নজরুল বাংলা সাহিত্যে 'রবীন্দ্র' সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যে একটা স্বাধীন স্বতন্ত্র করদহীন নজরুলীয় রাষ্ট্র গড়ে তুলেছেন। সে রাষ্ট্র যত ছোটই হোক না কেন তাকে বিচিত্র সমাহারে এবং স্বীয় শাসন ব্যবস্থায় আলাদা করে ফেলেন। রবীন্দ্রনাথের দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে সাহিত্য সাধনার পর নজরুলের এ কীর্তি অত্যন্ত দুঃসাহসিক, কৃতিত্বপূর্ণ এবং প্রশংসাযোগ্য। এ কৃতিত্বের ক্ষেত্রে নজরুল অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অবশ্য মাইকেল মধুসূদন দত্ত কাব্যের আংগিক ও ধারণার জগতে সর্ব প্রথম নতুনত্বের উদ্‌গাতা। রবীন্দ্রনাথ পরিশীলিত দৃষ্টি দিয়ে জীবন ও জগতকে দেখেছেন। নারী, শ্রমিক, কৃষক, উৎপীড়িতদের মুক্তি মন্ত্রের বিদ্রোহী-প্রকাশ রবীন্দ্র-সাহিত্যে ঘটেনি। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই শান্ত সমাহিত ভাব বিরাজিত। সেখানে ঋষির প্রজ্ঞা আছে কিন্তু সেই পরিমাণে সাধারণ মানুষের কথা নেই। সেখানে যে পরিমাণে দর্শনের জ্ঞান আছে, সে পরিমাণে প্রতিরোধের, বিরোধিতার দুর্বার আহবান নেই। সেখানে বিস্ময় আছে,

Dhaka University Institutional Repository

আনন্দ আছে কিন্তু বেদনার দুঃসহ চিত্রায়ণ নেই। নজরুলের মূলধন হৃদয়— তাই সমাজ ও স্বকালের অন্তস্থিত আহবানের ফলশ্রুতিকে অন্তরে ধারণ করেই তিনি কবি।

বাংলা সাহিত্যে নজরুল 'বিদ্রোহী কবি', 'বিপ্লবী কবি' নামে পরিচিত। কিন্তু বিদ্রোহের বাণী বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বেও কেউ কেউ উচ্চারণ করেছেন, যেমন- মধুসূদন, হেমচন্দ্র এবং সত্যেন্দ্রনাথ। এঁদের সাহিত্যেও প্রচলিত সমাজ, সংস্কার ও সমকালীন শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটেছে। নজরুলও বিদ্রোহ করেছেন, কিন্তু কেবল বিদ্রোহ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। অন্যদের কাব্য মূলতঃ বিদ্রোহের বাণীতেই পর্যবসিত হয়েছে, সেই বিদ্রোহের পরিণাম নেই, তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই সর্বোপরি রক্তাক্ত সংগ্রামের পরিচয় তাঁদের সাহিত্যে ততটা নেই। মধুসূদনে বিদ্রোহী রূপের যে অসঙ্কোচ ও অনবদ্য প্রকাশ ঘটে পরবর্তীকালে নজরুলে এসে সে রূপ সুতীক্ষ্ণতা ও সুস্পষ্টতা পায়। নজরুলের বিপ্লবী-বাণী জাতির প্রাণে বিপ্লব-বহ্নি জ্বালিয়ে দেয়।

নৈরাশ্য হাহাকারে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী উন্মাতাল তখন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরেজ সরকার প্রদর্শন করে একপেশে নীতি, জালিয়ানওয়ালাবাগে ঘটে নির্মম হত্যাকাণ্ড, যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী দেখা দেয় চরম আর্থিক সঙ্কট। বেকার সমস্যার কারণে মধ্যবিত্ত সমাজে দেখা যায় অসহনীয় অবস্থা। রুশ বিপ্লব আর তৎকালীন ইউরোপের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী লেখক হামসুন, লরেন্স প্রভৃতির লেখার প্রভাবে পুরনো যুগের চিন্তা-ভাবনায় প্রচণ্ড আঘাত আসে। মৃত্যু ও বেদনার মধ্য দিয়ে শোনা যায় নতুন যুগের আগমনের পদধ্বনি। জাতি তখন নতুন যুগকে, নতুন বাস্তবতাকে বরণ করে নেয়ার জন্য প্রস্তুত। ঠিক সে যুগের মানস রূপটি নজরুলে এসে ধরা পড়েছে। তাঁর লেখার সর্বত্র সেই বৈপ্লবিক যুগের আপামর জনতার দৃপ্ত জয়যাত্রার উন্মুক্ত প্রতিচ্ছবি চিত্রিত হয়েছে। মাও সে তুং বলেছেন, "শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির উৎস হচ্ছে জনগণের সামাজিক জীবন। মতবাদগত রূপ হিসাবে শিল্প-সাহিত্যের রচনার উৎপত্তি হয় মানুষের মগজে, কোন বিশেষ সমাজের জীবনের প্রতিফলন হয় তাই থেকে। তেমনি বিপ্লবী শিল্পসাহিত্যের রচনার উৎপত্তি হয় বিপ্লবী শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মগজে জনগণের জীবনের যে প্রতিফলন হয় তাই থেকে।"[৭] ... এ কথার সূত্র ধরে বলা যায় নজরুল যে সাহিত্য রচনা করেছেন তা বিপ্লবী সাহিত্য।

পরাধীন দেশের মানুষের প্রাণের দাবি যেমন উত্থাপিত হয়েছে নজরুলের লেখায়, তেমনি যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের যাঁতাকলে পিষ্ট জনতার সমস্যার রূপটি একেবারে অবিকৃতভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর সাহিত্যে। কেননা, উপমহাদেশের অস্থির জীবনের দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা, চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা তাঁকে আন্দোলিত করেছে। যুগধর্মকে অস্বীকার করা বা এড়িয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

বিদ্রোহ ও বিপ্লবের অঙ্গীকার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে নজরুল বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন। তিনি বলেন-

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু

(ধূমকেতু/অগ্নি-বীণা)

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষেই নজরুল 'মহাবিপ্লব'ই আনতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। যে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তন আসবে, তিনি সেই বিপ্লব চেয়েছেন। এই বিপ্লব চেতনা দেশবাসীর মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেছেন তাঁর রচনায়। নজরুলের বিপ্লবী মানসপ্রবণতা লক্ষ্য করে সেকালের প্রধান জননায়ক বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের পর নজরুল ইসলাম নতুন যুগের কবি। ... সমবয়স্ক যাঁহারা তাঁহারা তাঁহাকে সহায়তা করুন, কনিষ্ঠ যাঁহারা তাঁহারা তাঁহাকে নমস্কার করুন।'[৮] পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষ হওয়ায় নজরুলের বিদ্রোহ আর বিপ্লব পরাধীনতার বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু কেবল বিদেশী শাসকের কব্জা থেকে দেশকে মুক্ত করার অভিপ্রায়েই তাঁর বিপ্লবী অভিযাত্রা পরিচালিত হয়নি। দেশের আরও সমস্যার সমাধানকল্পেও তাঁর বিপ্লবী ভূমিকা অব্যাহত ছিল। তিনি রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন, সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন এবং ধর্ম ও জীবন সম্পর্কে মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন। আর এজন্যই তিনি বিপ্লবী কবি। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে নজরুলের বিপ্লবী চেতনার বিভিন্ন দিকগুলো আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১. শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত 'বঙ্গীয়শব্দকোষ' দ্বিতীয় ভাগ-স্পর্শবর্ণ, বিশ্বকোষ প্রেস, কলিকাতা, ১৩৪৪ সাল, পৃ: ২১১৪।

২. 'বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' বাংলা একাডেমীঃ ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, ১৯৭৪, পৃ: ৮১২।

৩. আশুতোষ দেব (সঙ্কলিত), 'ছাত্রবোধ অভিধান' অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার সুবৃহৎ শব্দকোষ, কলিকাতা, জুলাই, ১৯৭৫, পৃ: ১০৬৩।

৪. 'The Encyclopedia Americana' international edition, volume-23, 1927. Grolier Incorporated, Danbury. page-455.

৫. সালাহউদ্দীন আইয়ুব, 'আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতা', মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুলাই, ১৯৯৪, পৃ: ৪১।

৬. 'বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' বাংলা একাডেমীঃ ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ: ৮১২।

৭. কল্যাণ সুন্দরম্, 'বাংলা সাহিত্যে বস্তুবাদের ক্রমবিকাশ' পাবলিসিটি প্রিন্টার্স, কলিকাতা-৯, প্রথম প্রকাশঃ আগষ্ট-১৯৮৮, পৃ: ৩০।

৮. আতাউর রহমান, 'নজরুলঃ ঔপনিবেশিক সমাজে সংগ্রামী কবি', নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, আগস্ট, ১৯৯৩, পৃ: ২০-২১।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিদেশীদের আগমন ঘটে। ইংরেজদের আগমনের পূর্বে ভারত ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি নির্ভর একটি দেশ। কিন্তু ইংরেজরা ভারতের চিরাচরিত অর্থনৈতিক কাঠামোকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। বলা যায়, 'ইংরেজ শাসনে' ভারতের অবস্থান ছিল অনেকটা রূপ কথার সেই দুয়োরাণীর মত। বঞ্চনা, শোষণ ও উপেক্ষা ছিল যার নিয়তির লেখা।

ইংরেজ সরকার নিজেদের স্বার্থে ভারতে চিরাচরিত ভূমি সংক্রান্ত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে গ্রামীণ জীবনের গতিশীলতাকে বিনষ্ট করে দেয়। হুমকির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় গ্রামীণ মানুষের জীবন প্রণালীকে। শিথিল হয়ে যায় গ্রামীণ সমাজ জীবনের বন্ধন। গ্রামীণ জীবনে মানুষে মানুষে সহযোগিতার মনোভাবের পরিবর্তে সৃষ্টি হয় প্রতিযোগিতা। উৎপাদন প্রণালীতেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। উৎপাদিত দ্রব্য-সামগ্রী গ্রামীণ মানুষের চাহিদা না মিটিয়ে চালান হয়ে যায় বাইরে। ফলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেয়ে কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে এবং কৃষকের ভাগ্য হয় বিড়ম্বিত। কৃষকদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে নগদে খাজনা দিতে হত। এখানে tax dodging এবং tax evasion-এর কোন সুযোগ ছিল না বলে খাজনা পরিশোধ এবং অন্যান্য প্রয়োজন মিটানোর তাগিদে কৃষকদের অনেক সময় ফসল প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রী করে দিতে হত। আর এতে লাভবান হত ফসল কারবারি, দালাল আর মহাজনরা। কৃষকের লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই হত বেশী আর ভাগ্য হত অনিশ্চিত।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বছরে তিন হাজার টাকা প্রদানের অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট ফরুখ শিয়রের নিকট থেকে বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার যে অধিকার লাভ করে তাতে কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের কোন সুযোগ ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রেসিডেন্ট বা ইংরেজ ফ্যাক্টরির প্রধান কর্মচারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত ছাড়পত্রের সাহায্যেই কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য চলে আসছিল। কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীরা সম্রাটের আদেশ অমান্য করে ছাড়পত্রের অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত ব্যবসা শুরু করে।

বাংলা তথা ভারতে ইংরেজ কোম্পানি কর্মচারীদের বিনাশুল্কে ব্যক্তিগত বাণিজ্যের রমরমা কারবার শুরু হয় ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে জয় লাভের পর। তারা নিজেদের ব্যবসাকে সম্প্রসারিত করার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে। লবণ, তামাক ও সুপারির ব্যবসাও তাদের বাণিজ্যের আওতাভুক্ত হয়। কোম্পানির গোমস্তা, ইউরোপীয় বণিক, এমনকি বিত্তশালী ভারতীয় বণিকরা সম্মতি নিয়ে বিনা শুল্কে ব্যবসা শুরু করে। এভাবে লোভী-দুর্নীতিবাজদের ব্যক্তিগত উন্নয়নের নগ্ন প্রতিযোগিতায় জাতীয় সম্পদের হরণ ক্রিয়া চলতে থাকে বাধাহীনভাবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তার ভারতবর্ষীয় দুর্নীতিবাজ অনুচরদের গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে হতভাগ্য সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ওঠে। ব্যবসার ক্ষেত্রে ইংরেজদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলার শিল্প-বাণিজ্য ও বণিকদের সমাধি রচিত হয়। এক কথায়, এর ফলে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিগত সম্পত্তির কলেবর বৃদ্ধির জন্য কোম্পানির কর্মচারীরা কখনো কখনো জালিয়াতির আশ্রয় পর্যন্ত নিত। ব্যবসায়ের অনুমতি পত্র জাল করে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তা দেশী বণিকের নিকট বিক্রয় করত। এভাবে ব্যক্তিগত অনুমতি পত্র 'ব্যক্তিগত অত্যাচারের হাতিয়ারে' পরিণত হয়। কোম্পানির কর্মচারীরা উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে কৃষি ও শিল্পজাত পণ্য স্বল্পমূল্যে ক্রয় করে চড়া দামে বিক্রী করত। এভাবে কোম্পানির কর্মচারী ও তাদের দোসররা শুল্কমুক্ত বাণিজ্য করার সুবিধা ভোগ করে লাভবান হয় এবং দেশীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিলুপ্তির পথ তৈরী হয়।

যদিও দেশীয় বণিকরা ইংরেজ সরকারকে শুল্ক প্রদান করত তথাপি তাদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হত। ভারতীয় বণিকরা কৃষক ও তাঁতীদের কাছ থেকে সরাসরি দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারত না। এসব দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করার ক্ষমতা কোম্পানী এবং তার কর্মচারীদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সস্তায় ক্রয় করে কোম্পানির দালাল ও কর্মচারীরা তা ভারতীয় বণিকদের কাছে উচ্চ দামে বিক্রয় করত। কোন বণিক তা ক্রয় করতে অস্বীকার করলে তার ওপর নানা প্রকার দৈহিক নির্যাতন চালানো হত। এ অন্যায়ের কোন বিচার না থাকায় প্রতিকার না পেয়ে ভারতীয় বণিকরা ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে কৃষি কাজে আত্মনিয়োগ করে। এভাবেই ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের দখলে চলে যায়।

এক সময় ভারতে প্রস্তুত সুতী ও রেশমজাত বস্ত্র ইংল্যান্ড তথা ইউরোপে রফতানি করা হত। তারা আইন করে ভারতের সুতীশিল্প ধ্বংসের পরিকল্পনা করে। ১৭০০ এবং ১৭২০ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দুটি আইন পাসের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে ভারতীয় সুতীবস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। এছাড়াও ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যান্ডের ডাইরেক্টর সভা নির্দেশের মাধ্যমে ৪ বছরের জন্য ভারত থেকে রঙিন সুতীবস্ত্রের রপ্তানি নিষিদ্ধ করে। ইংরেজ সরকার স্বদেশে এসব পণ্যের উৎপাদন শুরু করে যান্ত্রিক তাঁতের সাহায্যে। ইংল্যান্ডের তাঁত শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের ক্ষেত্র হিসেবে ভারতকে ব্যবহার করা শুরু হয়। ভারতে উৎপাদিত তুলা ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে সেখানে প্রস্তুতকৃত তুলাজাত সামগ্রী ভারতের বাজারে এনে বিক্রয় করা শুরু হয়। যন্ত্রচালিত তাঁতের কাপড়ের সাথে ভারতের কুটির শিল্পগুলো প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হয়ে শিল্পগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। অথচ ইংরেজ সরকার কুটির শিল্প রক্ষার কোন উদ্যোগই নেয়নি। ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্প ধ্বংস করতে ইংরেজ সরকার এতটুকু কার্পণ্য করেনি।

ইংরেজ কোম্পানির একপেশে নীতির কারণে ভারতীয় শিল্পী ও কারিগররা ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে কৃষিকে তাদের জীবিকার্জনের উপায় হিসেবে বেছে নিয়েও রেহাই পায়নি। কৃষির উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অভাব এবং তার ওপর অব্যাহতভাবে খাজনা বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে কৃষিজীবীদের জীবন চরম সংকটের সম্মুখীন হয়। গ্রামীণ অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে মানুষকে জীবন ও মৃত্যুর মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়। কোম্পানির কর্মচারী ও জমিদারদের সম্মিলিত অত্যাচারে শত শত গ্রাম জনবিরল হয়ে যায়। গ্রামীণ অর্থনীতি ধ্বংসের ফলে সঙ্গতকারণেই নগর অর্থনীতিরও দুর্গতি নেমে আসে। শিল্পের ধ্বংসের ফলে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত শিল্প সম্পদে সমৃদ্ধ ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, সুরাট, মসুলিপট্টম, তাঞ্জোর প্রভৃতি নগরগুলো জনশূন্য হয়ে যায়। রবার্ট ক্লাইভের নিজের লেখা থেকেই জানা যায় উনবিংশ শতাব্দীর মুর্শিদাবাদ ও হুগলী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল লন্ডনের চেয়ে সমৃদ্ধিশালী ছিল। Anstey-র উক্তিটি এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্যঃ

Dhaka University Institutional Repository

'Indian methods of production and industrial and commercial organization could stand comparison with those in vogue in other part of the world.'[১]

ইংরেজরা ভারতকে তাদের রসদ সংগ্রহের ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করত। তাদের দেশে অবস্থিত বৃহদাকার কারখানার কাঁচামাল সংগ্রহ এবং ভারতে ব্রিটিশ দ্রব্যসামগ্রীর বাজার সৃষ্টির জন্য তারা নতুন রাজস্ব-বন্দোবস্তের প্রবর্তন করে। ওয়ারেন হেস্টিংস এর একাধিক রাজস্ব সংক্রান্ত সংস্কারের ফলে বাংলার অনেক পুরনো জমিদার পরিবার ধ্বংস হওয়ায় জমির সঙ্গে সম্পর্কহীন নতুন এক জমিদার শ্রেণীর জন্ম হয়। ইংরেজ সরকার ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত সংস্কার করে কৃষকদের ভূমিহীন চাষীতে পরিণত করে এবং এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ভূমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করে। যার ফল হচ্ছে সমাজে শোষক ও শোষিত শ্রেণীর উদ্ভব।

ইংরেজ শাসনামলে ভারতের অর্থ-সম্পদ ইংল্যান্ডে বাধাহীনভাবে পাচার হয়ে যায়। সে হিসেবে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে অর্থ-সম্পদের আগমন হয়নি বললেই চলে। বিরামহীনভাবে ভারতীয় অর্থ-সম্পদের বাইরে চলে যাওয়াকে ইংল্যান্ডের খ্যাতনামা বক্তা ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য এডমন্ট বার্ক 'ভারত হতে অবিরাম অর্থ-সম্পদের নির্গমন' বলে অভিহিত করেন। কোন কোন ইংরেজ ও ভারতীয় ঐতিহাসিক আবার এ নির্গমনকে 'ভারত লুণ্ঠন' বলে অভিহিত করেছেন। আর এ অর্থ-সম্পদের নির্গমনের সূচনা হয় পলাশীর যুদ্ধের পর, যা ছিল প্রকৃতই 'ভারত লুণ্ঠন'। কেননা কোম্পানি তখন আর ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর নিকট কৃপা বা অনুগ্রহ প্রার্থী থাকল না বরং নিজেরাই 'কৃপা ও অনুগ্রহ' বিতরণের ক্ষমতা লাভ করল। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা 'King Makers' বা নৃপতি স্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তাদের লুণ্ঠন কার্য শুরু হয় মীর জাফরকে সিংহাসনে বসাবার পর থেকে।

ইংরেজরা ভারতীয় নৃপতিদেরকে তাদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত করে বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলা তথা ভারতের অর্থ-সম্পদ দিয়ে নিজ দেশকে ধন্য করতে থাকে। এক সময়কার রৌপ্য ব্যবসা ভারতে বেশ সমৃদ্ধ ছিল। ইংরেজ কোম্পানি ভারতে রৌপ্য আমদানি করে ভারতের বাজারে বিনিয়োগ করত। কিন্তু ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ কোম্পানির হাতে চলে যাবার পর ভারতে রৌপ্য আমদানি বন্ধ করে দেয়া হয়। ভারতীয় রৌপ্য ও স্বর্ণ ইংল্যান্ডে পাচার করে দেয়া হয়।

কোম্পানির দুঃশাসনের ফলে বাংলা ১১৭৬ সালে মন্বন্তর দেখা যায় এবং তাতে দেশের দুই-তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হয়। তথাপি কোম্পানির খাজনা আদায় বন্ধ থাকেনি। যারা জীবিত ছিল তাদেরকে মৃতদের করও পরিশোধ করতে হয়েছে (যা নাজাই কর নামে পরিগণিত)।[২]

ইংরেজ শাসন ও শোষণের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে নীলচাষ। ইংরেজ নীলকরেরা এদেশে নীলচাষ করে কৃষক সমাজে হাহাকারের সৃষ্টি করে। নীল চাষের ফলে এদেশের কৃষি জীবনের গতানুগতিক ধারার বিপর্যয় ঘটে এবং নিপীড়িত নীল চাষীদের জীবনে নেমে আসে দারুণ হাহাকার। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমর্থন নিয়ে মিঃ এস্‌কল্‌ নামক জনৈক ইংরেজ নীলচাষকারী কুঠিয়াল বিপুল ভূমি দখল করে নীল চাষ করে। এতে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বহু মানুষ। ইংরেজী ১৮০১ সনে জেমস্‌ হিল নামক এক ইংরেজ কুঠিয়াল নিশ্চিন্তপুর-কার্পাসডাঙ্গার প্রায় গোটা এলাকা গ্রাস করে ফেলে—এসব অত্যাচারীদের চিত্র দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' এবং মীর মশার্‌রফ হোসেনের 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় পাওয়া যায়— যা

Dhaka University Institutional Repository

প্রামাণ্য দলিল। তৎকালে নীলকরদের অত্যাচারে মানুষ এতই অসহ্য হয়ে পড়ে যে তখন 'কাকের শত্রু চিল', 'চাষের শত্রু নীল', 'জাতের শত্রু হীল' (জেমস্ হিল)— এসব প্রবাদ প্রচলিত হয়। নীলকরদের দ্বারা অনেক সময় নারীদের সম্ভ্রম হারানোর ঘটনাও ঘটে।

ইংরেজরা এদেশকে একেবারে গ্রাস করে ফেলার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে নজর ফেরায়। স্যার চার্লস্ উড তাঁর শিক্ষা বিষয়ক ডেসপ্যাচে ভারতবর্ষে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন, মেকলের পরিকল্পনায় সে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ছিল 'এমন এক শ্রেণীর শিক্ষিত তৈরী করা, যারা রক্তে- বর্ণে হবে ভারতীয়, কিন্তু চিন্তা-চেতনায় হবে ইংরেজ।' বাস্তবে এরা হবে ইংরেজদেরও দোসর। এসব শিক্ষিতরা আরো শিক্ষিত লোক তৈরী করবে। তাই নিচের দিকে শিক্ষার চেয়ে ওপরের দিকে অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ওপর জোর দিয়েই ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ইংরেজ।

দীর্ঘ দিনের শাসন-শোষণকালে ইংরেজরা বহু অমানবিক ঘটনা ঘটিয়েছে। তারা মানুষ হত্যার পদক্ষেপ নিতেও এতটুকু কার্পণ্য করেনি। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড এবং ১৮৭৭ সালে চট্টগ্রামে চা শ্রমিকদের ওপর গুলি বর্ষণ— এ দুটো ঘটনা যাকে বলা যায় 'Tip of the iceberg' অর্থাৎ 'তুষারাবৃত মহাদেশের চূড়ামাত্র'। ইংরেজ শাসনে এরকম ঘটনার উদাহরণ আরো পাওয়া কষ্টসাধ্য নয়।

আসলে 'Power tends to corrupt: absolute power corrupts absolutely'— Lord Acton- এঁর একথা ইংরেজ শাসনকালের পরিপ্রেক্ষিতে মনে আসাই স্বাভাবিক।

অতঃপর ইংরেজদের বৈষম্যপূর্ণ দুঃশাসন ও শোষণাধীন অবিভক্ত ভারতে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে কাজী নজরুল ইসলাম জন্ম গ্রহণ করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ করেন তাঁর পরাধীন দেশমাতৃকার চরম দুর্দশা। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক দেশের সম্পদ লুণ্ঠন এবং রাজনৈতিক অধীনতার চরম অপমানকর বাস্তবতায় তিনি সচকিত হয়ে ওঠেন। ব্রিটিশ শাসনের উত্তাল পরিবেশে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি অভীপ্সায় নজরুল কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন। শোষক, নিপীড়ক ইংরেজদের এদেশে উপস্থিতি তাঁর কাছে বিষময় মনে হয়েছে। তাই সহজাত প্রবৃত্তি থেকে তিনি তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন। তিনি রচনা করেছেন 'অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেছেন বাঙলার অগ্নিযুগের আদি পুরোহিত সাগ্নিক বীর শ্রী বারীন্দ্র কুমার ঘোষকে। বারীন্দ্র কুমার ছিলেন অরবিন্দ ঘোষের ভ্রাতা; বিপ্লবী ভারতের বিপ্লববাদী আন্দোলনের অন্যতম নেতা। 'বিপ্লবে বিশ্বাসী নজরুল তাই নিজেকে বারীন্দ্রকুমারের 'স্নেহ-মহিমান্বিত শিষ্য' বলে উল্লেখ করে তাঁকেই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নি-বীণা' উৎসর্গ করেছেন।'[৩] তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছেন বিদেশীদের বিতাড়িত করার জন্য সুসংগঠিত শক্তির প্রয়োজন। সে শক্তির জয়গান উচ্চারিত হয়েছে 'অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'প্রলয়োল্লাস' এ। সর্ব প্রকার জড়তা আর পুরাতনকে ছিন্ন করে নব জীবনের আহবান করেছেন কবি এ কবিতায়। কবি সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 'আলো তার ভরবে এবার ঘর।'— বলে অভয় বাণী উচ্চারণ করেছেন—

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?— প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন!
আসছে নবীন— জীবন-হারা অসুন্দরে করতে ছেদন!

(প্রলয়োল্লাস/'অগ্নি-বীণা')

Dhaka University Institutional Repository

অতএব,

তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!

নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিদ্রোহী মানসিকতার পরিচয়বাহী কবিতা 'বিদ্রোহী'। এখানে কবি—

'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।' বলে স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর এ ঘোষণা যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে উচ্চারিত একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ কবিতার মাধ্যমে কবি শক্তির আধার আমিকে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। এ কবিতার মধ্যে আছে আমিত্বের উদ্বোধন, যে আমিত্বের অহংকারে ব্রিটিশ শক্তির পতন কামনা করেছেন কবি। 'বিদ্রোহী' একটি রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ কবিতা। এ কবিতায় অপশক্তির বিরুদ্ধে কঠোর বাণী উচ্চারিত হয়েছে। শাসনের নামে শোষণ ও অত্যাচারের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। পরাধীন ভারতের মর্মন্তুদ-জ্বালা ও ইংরেজ শাসকের সীমাহীন অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে নজরুল ইসলামের বেদনা, প্রচণ্ড ক্ষোভ ও বিদ্রোহাগ্নির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এ কবিতায়। বলা বাহুল্য, 'বিদ্রোহী' কবিতায় নজরুল ইসলাম পর্যাপ্ত পুরাণ প্রসঙ্গ ব্যবহারের মধ্য দিয়েই সরাসরি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা করেছেন। বিবেকানন্দ বলেছেন, নিজেকে দুর্বল ভাবা পাপ। তিনি কথাটা ক্ষুদ্রাকারে বলেই শেষ করে দিলেন যে, দুর্বলতা পাপ। কিন্তু নজরুল এ ধারণাকে রুখে দাঁড়ালেন অমিত তেজে, বজ্রনির্ঘোষ ভাষায়। তিনি আপোসহীন আমিত্বের উদ্বোধন ঘটাতে চেয়েছেন, যে আমিত্বের অহঙ্কার নিয়ে বীরত্বের তেজে সোজা হয়ে দাঁড়ালে হিমালয় পর্যন্ত তার সামনে মাথা নত করে। হিমালয়ের মাথা নত করার ব্যাপারটা আলঙ্কারিক বিবেচনা। প্রকৃত কথা হচ্ছে অহংবোধের ভেতর দিয়ে যথার্থ বীরত্বের উদ্ভাসন ঘটলে মানুষ ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে অসাধ্য সাধনে সক্ষম হয়। ইংরেজ প্রতিপক্ষকে এদেশ থেকে বিতাড়নের ব্যাপারে একথা প্রযোজ্য। কবি যখন বলেন—

'আমি উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে।

তখন 'নব সৃষ্টি' বলতে যে কবি শান্ত, স্বাধীন, ভয়শূন্য, নির্ভেজাল জীবনের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন একথা বুঝতে বোধ করি কারো অসুবিধা হয় না। কবি বিদ্রোহ ঘোষণা করার কারণ এবং তার স্থায়িত্বের সময়-সীমাও নির্দেশ করেছেন—

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

(বিদ্রোহী/'অগ্নি-বীণা')

প্রকৃতই নজরুল 'বিদ্রোহী' কবিতায় যে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন তার মূল লক্ষ্য অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ থেকে উৎপীড়িতকে রক্ষা করা।

Dhaka University Institutional Repository

'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতায়ও কবি ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য মূলতঃ শক্তির আবাহন করেছেন। এক্ষেত্রে জগৎমাতার দনুজ-দলনী অশিব-নাশিনী চণ্ডী-রূপকে আহবান জানিয়েছেন। মাতা শ্বেত শতদল-বাসিনী রূপ নয় রক্তাম্বরধারিণী রূপ ধারণ করুক এটাই কবির একান্ত প্রত্যাশা। কবির আহবান—

রক্তাম্বর পর মা এবার
জ্ব'লে পুড়ে যাক শ্বেত বসন;
দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন
বাজে তরবারি ঝনন্-ঝন্।

(রক্তাম্বরধারিণী মা/অগ্নি-বীণা)

শ্বেত বা সাদা শান্তির প্রতীক আর লাল হচ্ছে অশান্তি বা ভয়ংকরের প্রতীক। কবি সময়ের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে জালিমের বুকের রক্তে শ্বেত হরিৎ লাল রংয়ে রঞ্জিত করার পক্ষে জোড়ালো বক্তব্য তুলে ধরেছেন। মায়ের কল্যাণময় রূপই ধ্বংসের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে অত্যাচারী, জালিমের নির্যাতন থেকে মুক্তির নিশ্চয়তা বিধান করবে এটা কবির দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁর প্রত্যাশা—

জালিমের বুক বেয়ে খুন ঝ'রে
লালে লাল হোক শ্বেত হরিৎ।

(রক্তাম্বরধারিণী মা/ অগ্নি-বীণা)

'আগমনী' কবিতায় দুর্গা যে রুদ্ররূপ ধরে দুর্গতির বিনাশ সাধন করেছিলেন সেই দুর্গামূর্তির আবাহন করেছেন কবি। প্রলয়-দোলার কম্পন অনুভব করার পাশাপাশি জগৎমাতার রণ-রঙ্গিণী রূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এ মহারণ বা মহাযুদ্ধ দানব শক্তির বিরুদ্ধে মানবের জয়ের যুদ্ধ। মানবাত্মার মুক্তি অর্জনের যুদ্ধ। কবি শ্বেতাঙ্গ শাসকদেরকে দানবের সাথে তুলনা করে জগৎবাসীকে আশ্বস্ত করছেন যে পশু-শক্তি চিরকাল টিকে থাকতে পারে না। তিনি বলছেন—

পদতলে লুটে মহিষাসুর,
মহামাতা ঐ সিংহ-বাহিনী জানায় আজিকে বিশ্ববাসীকে—
শাশ্বত নহে দানব-শক্তি, পায়ে পিষে যায় শির পশুর!

(আগমনী/অগ্নি-বীণা)

কবিতাটিতে কবি ঔপনিবেশিক প্রভুদের বিতাড়িত করার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন সে শক্তির কথা উচ্চারণ করেছেন। কবি এজন্য নির্যাতিত জনতাকে তাদের অন্তঃশক্তি ব্যবহারের আহবান জানিয়েছেন। নজরুল গুরুত্ব দিয়েছেন মানুষকে গণমানবশক্তিতে প্রত্যয়ী হওয়ার এবং তাদের দুর্বার সংগ্রামী হয়ে ওঠার ওপর।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া ইংরেজ প্রভুদের বিতাড়নে ব্যর্থ হবার কোন সম্ভাবনাও নজরুল উপলব্ধি করেন না। কারণ—

ধর্‌বো পা'য় কার সে আর
বিশ্ব-মা'ই পার্শ্বে যার?

(আগমনী/'অগ্নি-বীণা')

অতএব আপোষহীন সংগ্রামই একমাত্র পথ।

নজরুলের রাজনৈতিক চেতনা রুশ বিপ্লব ও নব্য তুর্কী আন্দোলনের প্রভাবে সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত হয়। তার মধ্যে তুরস্কের প্রভাব সর্বাধিক কার্যকর হয়। মোস্তফা কামালের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে তুরস্ক রাজতন্ত্র, পর্দা প্রথা, মোল্লাতন্ত্র প্রভৃতি থেকে মুক্তি লাভ করে। ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামী, সামন্ততন্ত্রকে পদদলিত করে তুরস্ক আধুনিক রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। তুরস্কের এ সাফল্য থেকে বিশ্বের অপরাপর মুসলিম দেশ বিশেষ করে ভারতীয় মুসলমানদের শেখার অনেক কিছু ছিল। সঙ্গতকারণে কামালের প্রতি নজরুল ছিলেন খুব শ্রদ্ধাশীল। ১৯২১ সালের জুলাই মাসে গ্রীকরা নতুন করে তুরস্ক আক্রমণ আরম্ভ করে। এমতাবস্থায় কামাল স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়ে প্রত্যাক্রমণ করেন এবং বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধে তাদেরকে শোচনীয়ভাবে (২৪শে আগস্ট তারিখে) পরাজিত করেন। এ যুদ্ধই ইতিহাসে 'সাকারিয়া যুদ্ধ' নামে খ্যাত। এ যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করায় জাতীয় সংসদ কামাল পাশাকে 'গাজী' উপাধিতে ভূষিত করে। সাকারিয়া যুদ্ধ জয়ের পটভূমিতেই 'কামাল পাশা' কবিতাটি রচিত হয়। নজরুল কামাল পাশার সাফল্যে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন কলকাতার রাজপথে—

কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

গ্রীকদেরকে ধিক্কার দিয়ে বল্‌লেন,

পরের মুলুক লুট ক'রে খায়, ডাকাত তারা ডাকাত!
তাই তাদের তরে বরাদ্দ ভাই আঘাত শুধু আঘাত!

(কামাল পাশা/ 'অগ্নি-বীণা')

কিংবা,

আজাদ মানুষ বন্দী ক'রে, অধীন ক'রে স্বাধীন দেশ,
কুল মুলুকের কুষ্টি ক'রে জোর দেখালে ক'দিন বেশ,

(কামাল পাশা/ 'অগ্নি-বীণা')

আসলে নজরুল কবিতাটির বিভিন্ন অংশে পর রাজ্য অধিকারীদের প্রতি চরম ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং স্বাধীনতার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন। যেহেতু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিতাড়নকামনাই তাঁর চিন্তাবীজ, তাই কবিতাটিতে কবির স্বদেশভূমির পরাধীনতায় ক্ষোভ এবং মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ দুর্লক্ষ্য নয়।

Dhaka University Institutional Repository

তুরস্ক আক্রমণকারী গ্রীক বাহিনীকে উপলক্ষ করে নজরুল এ কবিতা রচনা করলেও এর মধ্য দিয়ে তিনি পরোক্ষভাবে ভারতের ইংরেজ শাসকদেরই 'গৃধ্নু', 'লুব্ধ', 'হিংস্র পশু', 'অত্যাচারী' বা 'জালিম' বলে অভিহিত করেছেন। কবির ভাষায়—

গৃধ্নু ওরা, লুব্ধ ওদের লক্ষ্য অসুর বল—
হিংস্র ওরা হিংস্র পশুর দল।
জালিম ওরা অত্যাচারী!
সার জেনেছে সত্য যাহা হত্যা তারই!
জালিম ওরা অত্যাচারী!

(কামাল পাশা/"অগ্নি-বীণা')

নজরুল 'আনোয়ার' কবিতাটি রচনা করেন তুরস্কের বিখ্যাত সেনানায়ক আনোয়ার পাশাকে নিয়ে। বিষয়ের দিক থেকে এ কবিতাটি 'কামাল পাশা' কবিতার সমার্থক। আনোয়ার পাশা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। আনোয়ারের এহেন তৎপরতা নজরুলকে আকৃষ্ট করে। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হলে আনোয়ার পাশা দেশত্যাগ করেন। তিনি বিদেশের ঘাঁটিতে থেকে দেশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন সংঘটনের চেষ্টা করেন। প্রথমে জার্মানির সাহায্য প্রার্থনা করে ব্যর্থ হয়ে রাশিয়া চলে যান। সেখানে তুর্কি প্রতি-বিপ্লবীদের সংগে যোগ দেন। তিনি ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। তিনি তৎকালীন ভারতের খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। আফগানিস্তানের বাদশাহ্ আমানুল্লাহর সমর্থন লাভের আশায় কাবুলে তাঁর সদর দফতর স্থাপন করেন। আনোয়ার পাশার এ ইংরেজ বিরোধী তৎপরতায় নজরুল আকৃষ্ট হন। এ কবিতায় নজরুল ভারতবাসী তথা বিশ্বের স্বাধীনতাকামী মানুষকে জাগাতে চেয়েছেন, মানবশক্তির উত্থান কামনা করেছেন। এ কবিতায় কবি মুসলমান তথা পরাধীন জাতির দুর্ভাগ্যের পশ্চাতে বিদ্যমান কারণ নির্ণয় করেছেন। তিনি সীদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মুসলমান তার মূল শিক্ষা থেকে দূরে সরে আসার কারণেই আজ তারা দিক্‌দার। তাই এ কবিতার মধ্য দিয়ে কবি মানুষকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন স্বাধীনতার পথে অধীনতার বিরুদ্ধে। পরাধীন জাতির করুণ হাহাকার ধ্বণিত হয়েছে এভাবে—

আনোয়ার! জিঞ্জির—
পরা মোরা খিঞ্জীর?
শৃঙ্খলে বাজে শোনো রোনা রিণ্-ঝিন্‌কির,—
নিবু-নিবু ফোয়ারা বহ্নির ফিন্‌কির!
গর্দানে জিঞ্জির!

(আনোয়ার/'অগ্নি-বীণা')

এখানে নিজেদের অধীনতার প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা আর বিদেশী শাসকদের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষোভের প্রকাশ লক্ষ্যযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

'কোরবানী' কবিতায় নজরুল তাঁর কাঙ্ক্ষিত শক্তির উদ্বোধনের জন্য মন্ত্ররূপ-বাণী উচ্চারণ করেছেন। ন্যায়ত এবং ধর্মত যা সত্য তার ওপর অধিকার বা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য যে একাগ্র সংকল্প তা-ই সত্যাগ্রহ। এ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্বোধন ঘোষিত হয়েছে এ কবিতায়। 'কোরবানী' কবিতার মর্মবাণীর সাথে 'অগ্নি-বীণা' কাব্যের 'রক্তাম্বরধারিণী মা' এবং আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতার একটি অন্তর্নিহিত সাযুজ্য রয়েছে।

'কোরবানী' কবিতাটি ১৩২৭ শ্রাবণ (ইংরেজী ১৯২০ জুলাই)-এর 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত তরিকুল আলমের লেখা প্রবন্ধ 'আজ ঈদ'-এর জবাবে রচিত। তরিকুল আলম তাঁর প্রবন্ধে 'কোরবানী'র ঈদকে বর্বরতার উৎসব হিসেবে, নিষ্ঠুরতা, নির্মমতার অনুষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সাধারণভাবে এটাকে পণ্য বা প্রাণী হত্যার একটি অমানবিক অপকর্ম বলে চিহ্নিত করেছেন।

কিন্তু নজরুল এটাকে যথার্থ বলে মেনে নেননি। তিনি অভিযোগটিকে গভীরে না এনে একটা চিন্তাহীন বক্তব্য বলে মনে করেন এবং এর একটি যৌক্তিক জবাব দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি এর জবাব একটি গদ্য আলোচনা বা প্রবন্ধে না দিয়ে জবাবটি দেন কবিতায়। নজরুল শুরুতেই বলেন—

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!

(কোরবানী/'অগ্নি-বীণা')

উপমহাদেশ তখন ব্রিটিশ শাসনের শৃংখলে আবদ্ধ। নজরুল ঠিকই বুঝেছিলেন দুর্বলতা দিয়ে এ শৃংখলতা মোচন সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন যুদ্ধের, প্রয়োজন শক্তি ব্যবহারের। শক্তি ব্যবহারের মধ্যে নিষ্ঠুরতা থাকে। কিন্তু তথাপি কল্যাণের জন্য আপাতদৃষ্টির নিষ্ঠুরতার প্রয়োজন। যুক্তিসঙ্গত কারণেই নজরুল লিখলেন—

আস্তানা সিধা রাস্তা নয়,
'আজাদী' মেলে না পস্তানো'য়
দস্তা নয় সে সস্তা নয়!

(কোরবানী/'অগ্নি-বীণা')

নজরুল অনুভব করেছেন যে সহজ উপায়ে কেবল মুখের মিষ্টি কথায় স্বাধীনতা আসবে না— তা অর্জিত হবে রক্তাক্ত যুদ্ধের বিনিময়ে। সেজন্য কবিতার অন্তিম স্তবকে লিখেছেন—

ঐ খুনের খুঁটিতে কল্যাণ-কেতু, লক্ষ্য ঐ তোরণ,

(কোরবানী/'অগ্নি-বীণা')

মহৎ লক্ষ্যে পৌছাতে হলে রক্ত নিতে এবং দিতেও হবে। বৃহৎ আত্মত্যাগ ব্যতীত এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। অতএব 'কোরবানী' বর্বরতা নয়—মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতীক, স্বাধীনতা অর্জনের প্রেরণা। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি একটি বিষয়ে অবগত যে বিদ্রোহ-বিপ্লব তাদের প্রশাসনের স্থায়িত্বের জন্য বিপজ্জনক। সেজন্য কোন বিদ্রোহ-বিপ্লব যাতে প্রশ্রয় না পায় বা তার উদ্ভবের পরিবেশ সৃষ্টি না হয় সেজন্য তাদের

Dhaka University Institutional Repository

স্বপক্ষের কিছু তাঁবেদার বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করে এরা প্রচার করে ছদ্মবেশী প্রেম ও মানবিকতা— এরা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা করে। তরিকুল আলমের লেখাটিকে এধরনের একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থের উচ্চারণ বলে মনে করেছেন। যে দেশের মায়েরা এবং যে দেশের জনগণ হাসিমুখে নিজের পুত্রকে এমনিভাবে বৃহত্তর স্বার্থে উৎসর্গ করতে পারেন সে দেশকে কোন বিদেশী শক্তি নিজের অধীনে রাখতে পারে না বলে নজরুল মত ব্যক্ত করেছেন।

কবি নজরুল জেলে বেশ কিছু কবিতা রচনা করেন। এর মধ্যে 'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সেবক' কবিতাটি অন্যতম। হুগলী জেলে অনশন ধর্মঘটরত নজরুলের হৃদয়ে স্বদেশের পরাধীনতার চিন্তা যে জ্বালা ধরিয়েছিল তার রূপায়ণ ঘটেছে 'সেবক' কবিতায়। কবিতার প্রারম্ভে দেশের শত্রু, সত্য-হন্তা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ভয় ও দুর্বলতাকে তুচ্ছ করে বীরদর্পে রুখে দাঁড়াবে এমন সাহসী সত্য সাধকের সন্ধান করেছেন কবি। সত্যকে জয় করার পথে প্রয়োজনে প্রাণ বিসর্জনে প্রস্তুত এমন বীরের অভাববোধ থেকেই কবিতাটির সৃষ্টি। অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ পায়ে দলে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিটাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিতে পারে এমন এক আজাদ মানব কবির আকাঙ্ক্ষার ধন। জনগোষ্ঠীর দিকে কবির অনুসন্ধানী দৃষ্টিপাত—

সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়,
নেই কি রে কেউ সত্য-সাধক বুক খুলে আজ দাঁড়ায়?—
শিকলগুলো বিকল ক'রে পায়ের তলায় মাড়ায়,—
বজ্র-হাতে জিন্দানের ঐ ভিত্তিটাকে নাড়ায়?
নাজাত-পথের আজাদ মানব নেই কি রে কেউ বাঁচা,
ভাঙতে পারে ত্রিশ কোটি এই মানুষ-মেষের খাঁচা?

(সেবক/'বিষের বাঁশী')

এ কবিতায় দেশ মাতৃকার আহবানে 'জয়-সত্যম' বলে কারার দুয়ার ঠেলে যে তরুণ সেবক মশাল হাতে নিয়ে এগিয়ে আসে তাকে কবিরই প্রতিমূর্তি হিসেবে মনে হয়। দেশ প্রেমিক নজরুল এ কবিতায় নিজের ভাবমূর্তিকে তুলে ধরার পাশাপাশি উপলব্ধি করেছেন গণমানবের অনিবার্য উত্থান। কবির ভাষায়—

ফন্দী-কারায় কাঁদছিল হায় বন্দী যত ছেলে,
এমন দিনে ব্যথায় করুণ অরুণ আঁখি মেলে,
পাবক-শিখা হস্তে ধরি' কে তুমি ভাই এলে?
"সেবক আমি"— হাঁক্‌লো তরুণ কারার দুয়ার ঠেলে।

(সেবক/'বিষের বাঁশী')

হতাশাগ্রস্ত জাতির মুক্তির পথ নির্দেশের জন্য, নৈরাশ্য হাহাকারে নিস্তেজ মানুষকে নবজীবনের প্রত্যাশায় আন্দোলিত করার জন্য কবি এমন তরুণ মুক্তি সেবককে আহবান জানিয়েছেন যে ভয়ে পশ্চাদপদ

Dhaka University Institutional Repository

হবে না। যে ভয়কে গ্রাস করবে অথচ ভয় যাকে গ্রাস করতে পারবে না। মৃত্যু-ভয়কে উপেক্ষা করে দানব বিতাড়নে আগ্রহী বীরই কবির কাম্য। তাই কবির জিজ্ঞাসা:—

নেই কি রে কেউ মুক্তি-সেবক শহীদ হবে ম'রে,
চরণ-তলে দল্‌বে মরণ ভয়কে হরণ ক'রে,

(সেবক/বিষের বাঁশী)

অথবা

দানব দ'লে শান্তি আনে নাই কি এমন ছেলে?—
এ কি দেখি গান গেয়ে ঐ অরুণ আঁখি মেলে
পাবক-শিখা হস্তে ধ'রে কে বাছা মোর এ'লে?—
"মাগো আমি সেবক তোমার! জয় হোক মা'র।"
হাঁক্‌লো তরুণ কারার-দুয়ার ঠেলে!

(সেবক/বিষের বাঁশী)

কবি নজরুল দেশ-মাতৃকার মুক্তির প্রয়োজনে যে তরুণ সেবকের স্বরূপ কল্পনায় এনেছেন তা যে কবির নিজেরই আদলে গড়া তা খুব সহজেই বুঝে নেয়া যায়—

হঠাৎ দেখি আস্‌ছে বিশাল মশাল হাতে ও কে?
"জয় সত্যম্" মন্ত্র-শিখা জ্বল্‌ছে উজল চোখে।
রাত্রি-শেষে এমন বেশে কে তুমি ভাই এলে?—
"সেবক তোদের, ভাইরা আমার!— জয় হোক মা'র!"
হাঁক্‌লো তরুণ কারার দুয়ার ঠেলে!

(সেবক/বিষের বাঁশী)

পৃথিবীতে স্রষ্টা মানুষকে কারো অধীন করে সৃষ্টি করেন নি। সব মানুষেরই স্বাধীনভাবে বিচরণের অধিকার বিদ্যমান। মানুষ নৈতিক ও যৌক্তিকভাবে স্বাধীন জীবন অতিবাহিত করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই অধিকার হরণ করে অধীনতার শিকলে শৃঙ্খলিত করা অনৈতিক ও অমানবিক কাজ। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাধীনতার জন্য মানব মনের আকুতি প্রকাশ করতে গিয়ে ভীমসিংহের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়।

(পদ্মিনী উপাখ্যান)

Dhaka University Institutional Repository

কবি নজরুলও দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছেন অধীনতার বিরুদ্ধে। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসার সংগ্রামে সুদৃঢ় অবস্থান নেয়ার জন্যে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এ তৎপরতায় প্রয়োজনে কারাবরণ করেও কবি নির্যাতিত মানুষকে আহবান জানিয়েছেন। কারণ এ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই অমানবিক-পরিবেশ থেকে মানবের উত্তরণ ঘটবে এবং সম্মিলিত মানুষের তথা দেশমাতৃকার মুক্তি নিশ্চিত হবে। নির্ভীক, বিদ্রোহী সৈনিক নজরুলের দুর্জয় উচ্চারণ—

মুক্ত বিশ্বে কে কার অধীন? স্বাধীন সবাই আমরা ভাই।

ভাঙিতে নিখিল অধীনতা-পাশ মেলে যদি কারা, বরিব তাই।

(বন্দনা-গান/বিষের বাঁশী)

বিদেশী শাসকের কাছ থেকে নিজের দেশের মুক্তি ছিনিয়ে আনার জন্য নজরুল সম্মিলিত প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। ভারতবর্ষ যেহেতু হিন্দু-মুসলিম সহ আরো নানা ধর্মের মানুষের বাস তাই কবি ধর্মের পরিচয়হীন এক সম্মিলিত মানবশক্তির সংগ্রামস্পৃহার উজ্জীবন কামনা করেছেন। একই দেশে বিবিধ ধর্মের ঐক্য সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি মানবতাবাদী—

মুক্তির লাগি মিলনের লাগি আহুতি যাহারা দিয়াছে প্রাণ

হিন্দু-মুস্‌লিম্‌ চলেছি আমরা গাহিয়া তাদেরি বিজয়-গান॥

(বন্দনা-গান/বিষের বাঁশী)

কবি নজরুল ইসলাম 'ধূমকেতু' (১৩২৯) নামে একটি অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কবি নিজেই। এতে যেসব খবর পরিবেশিত হত তার শিরোনামাও কবিতাকারে ছাপা হত। সরকার এবং সরকারের চাটুকারদের বিরুদ্ধেও ছড়ার ছন্দে শিরোনামা লিখে তিনি তাদের ঘায়েল করতে থাকেন। অবশ্য সম্পাদকের পরিবর্তে 'সারথি' লেখা হত। নজরুল সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মাধ্যমে অগ্নিবর্ষণ করতে থাকেন। 'ধূমকেতু'র প্রথম বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' শীর্ষক কবিতা লেখার জন্য নজরুল রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। বিচারে কবি এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এসময় নজরুল আত্মপক্ষ সমর্থন করে আদালতে যে জবানবন্দী দেন তা বিভিন্ন কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাতে কবি যে নির্ভীকতার পরিচয় দেন তা তুলনারহিত। দণ্ডের পর কবি কিছু দিন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে থাকেন। অতঃপর ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল কবিকে হুগলি জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে জেল কর্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে নজরুল অনশন ধর্মঘট পালন করেন। ফলে কবি নিত্য-নূতন শাস্তি ভোগ করতে থাকেন। কিন্তু 'বিদ্রোহী কবি' কিছুমাত্র ভীত না হয়ে বরং নব উদ্যমে নতুন নতুন ব্যঙ্গ সঙ্গীত রচনা করে ও দলবল সহযোগে তাণ্ডব নৃত্য করে তা গেয়ে জেল কর্তৃপক্ষকে ভাবিত করে তোলেন। জেলে রচিত এসব সঙ্গীতগুলোর মধ্যে 'শিকল-পরার গান' অনন্য যা জেল থেকে পাচার হয়ে বাইরে এসে জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং গীত হতে থাকে। কারান্তরালে বসেই কবি গাইলেন শিকল ভাঙার গান—

Dhaka University Institutional Repository

এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল।

এই শিকল প'রেই শিকল তোদের কর্‌ব রে বিকল॥

(শিকল-পরার গান/বিষের বাঁশী)

ঔপনিবেশিক কুশাসনের বিরুদ্ধে যখন এদেশের মানুষের অসন্তোষ চরমে পৌঁছে, বিদ্রোহের দাবানল যখন দেশময় ছড়িয়ে পড়ে তখন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার জনমতকে বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন করে সমাজ সেবক ও দেশকর্মী তরুণ-তরুণীদের শ্রীঘরে পাঠাতে শুরু করে। ভিনদেশী শাসকগোষ্ঠীর এহেন আচরণে কবি নজরুল আরো জ্বলে ওঠেন। বিপ্লবের প্রেরণাদানকারী কারাগারে বসেই নজরুল বিপ্লবী গানের অগ্নিবাণী উচ্চারণ করেন—

ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল-ঝঞ্জনা,

এ যে মুক্ত-পথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা!

(শিকল-পরার গান/বিষের বাঁশী)

'গান্ধীজী-পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম কর্মসূচী ছিল চরকায় সুতো কাটা।'[৪] অসহযোগ আন্দোলন বস্ত্রশিল্পে স্বাবলম্বী হওয়ার মন্ত্রে এদেশের মানুষকে উজ্জীবিত করে। গান্ধীজী প্রচার করেন চরকার বদৌলতে যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসবে তা রাজনৈতিক স্বাধীনতার পথকে সুগম করবে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত চরকার মাহাত্ম্য কীর্তন করে 'চর্‌কার গান' ও 'চর্‌কার আরতি' নামে দুটি কবিতা রচনা করেন। চর্‌কাকে জাতির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করার জন্য তিনি দেশবাসীকে ডাক দেন—

চর্‌কার ঘর্ঘর শ্রেষ্ঠীর ঘর-ঘর!

ঘর-ঘর সম্পদ্—আপনায় নির্ভর!

(চর্‌কার গান/বিদায় আরতি)

সত্যেন্দ্রনাথের গান জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উজ্জীবিত করার আবেদন সংবলিত, কিন্তু তাতে আন্তরিকতার চেয়ে ভঙ্গিই বেশী। নজরুল যে 'চরকার গান' রচনা করেন তাতে সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব থাকলেও এবং একই সুর ধ্বনিত হলেও তাঁর কবিমন আরো একধাপ এগিয়ে। এ কবিতায় স্বদেশী আন্দোলনের স্বরূপ সম্পর্কে কবির দৃষ্টিভঙ্গী অপেক্ষাকৃত প্রখরতর। চরকা 'ঘোরার শব্দে' 'স্বরাজ-সিংহদ্বার' খোলার শব্দ শুনতে পাওয়ার মধ্য দিয়ে অবিলম্বে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য কবির দৃঢ় প্রত্যয়ী মনোভাব প্রকাশিত। এজন্য চরকাকে উপলক্ষ ক'রে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃতুল্য সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করেছেন। চরকার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন—

Dhaka University Institutional Repository

তোর ঘোরার শব্দে ভাই

সদাই শুন্‌তে যেন পাই

ঐ খুল্‌ল স্বরাজ-সিংহদুয়ার, আর বিলম্ব নাই।

ঘু'রে আস্‌ল ভারত-ভাগ্য-রবি, কাট্‌ল দুখের রাত্রি ঘোর॥

... ...

হিন্দু-মুসলিম দুই সোদর,

তাদের মিলন-সূত্র-ডোর রে

রচ্‌লি চক্রে তোর,

তুই ঘোর্ ঘোর্ ঘোর্।

(চরকার গান/বিষের বাঁশী)

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে যারা প্রকাশ্যে ইংরেজদের বিরোধিতা করে, কিন্তু গোপনে সেই ইংরেজের তোষণ করে তাদের বিরুদ্ধে এক সময় কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চারণ করেন—

পরের অধীন দাসের জাতি "নেসেন্" আবার তারা?

তাদের আবার "এজিটেসন্"— নরুন উঁচু করা।

(হায় কি হলো?—/বিবিধ)

পরাধীনতার কারণ হিসেবে ইংরেজদের তোষণকে চিহ্নিত করে হেমচন্দ্র যেমন উপর্যুক্ত উক্তি করলেন, ঠিক তেমনি কংগ্রেসী চক্রের গোপন ষড়যন্ত্রকে উপলব্ধি করে নজরুল লিখলেন—

পেটে এক আর মুখে আরেক— এই যে তোদের ভণ্ডামি,

এতেই তোরা লোক হাসালি, বিশ্বে হলি কম্-দামি।

(বিদ্রোহী বাণী/বিষের বাঁশী)

মুনাফেকির প্রকৃতি বর্ণনা করে অপর জায়গায় কবি বলেছেন—

বুকের ভিতর ছ-পাই ন-পাই, মুখে বলিস্ স্বরাজ চাই,

স্বরাজ কথার মানে তোদের ক্রমেই হচ্ছে দরাজ তাই!

(বিদ্রোহী বাণী/বিষের বাঁশী)

ব্রিটিশ শাসিত অবিভক্ত ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন অভিন্ন লক্ষ্য অর্জন করতে পারছিল না। আন্দোলনের নেতৃত্ব দ্বিধাগ্রস্ত এবং বিভ্রান্ত ছিল বলে আন্দোলন জোরদার হতে পারছিল না। নেতৃবৃন্দ কখনো স্বায়ত্তশাসনের দাবী উত্থাপন করেছেন আবার কখনো চেয়েছেন ডোমিনিয়ন স্টেটাস। সবাই স্বরাজ

Dhaka University Institutional Repository

চেয়েছেন, কিন্তু সে স্বরাজের সংজ্ঞা একেক জনের কাছে ছিল একেক রকম। এরকম মতের অনৈক্য হওয়ায় নজরুল ইসলাম ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন—

"ভারত হবে ভারতবাসীর"— এই কথাটাও বল্‌তে ভয়!
সেই বুড়োদের বলিস্ নেতা— তাদের কথায় চল্‌তে হয়।

(বিদ্রোহী বাণী/বিষের বাঁশী)

কবি নজরুল ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে রূপকাশ্রয়ের মাধ্যমেও তাঁর বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। 'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'অভিশাপ' কবিতায় কবি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সীমাহীন বিদ্রোহ প্রকাশ করে প্রকারান্তরে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ভারতবাসীর বিরূপ মনোভাব ও বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ঈশ্বর পদানত অবহেলিত মানুষ এখানে স্বৈরাচারী ব্রিটিশ রাজশক্তি কর্তৃক নির্যাতিত নিপীড়িত ভারতবাসী। ভারতবাসীকে দুর্বলতা পরিহার করে আত্মশক্তিতে শক্তিমান হয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ ভারতবাসী সম্মিলিতভাবে গর্জে উঠতে পারলেই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘটবে, ব্রিটিশ প্রভুত্বের বিলোপ হবে। কবির দৃঢ় উচ্চারণ—

আমি বিধির বিধান ভাঙিয়াছি, আমি এমনি শক্তিমান!
মম চরণের তলে, মরণের মার খেয়ে মরে ভগবান।

(অভিশাপ/বিষের বাঁশী)

অন্যত্র,

জাপটি' ধরিয়া বিধাতারে আজো পিষে' মারি পলে পলে,
এই কাল সাপ আমি, লোকে ভুল ক'রে মোরে অভিশাপ বলে।

(অভিশাপ/বিষের বাঁশী)

উদ্ধৃত অংশের 'মরণের মার' কিংবা 'পিষে' মারি পলে পলে' প্রভৃতি বক্তব্যের ভেতর দিয়ে কবি যেন তাঁর সংগ্রামের বিপক্ষ শক্তি 'বাইরের শক্তি'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অগ্নিবাণী নিক্ষেপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে রফিকুল ইসলাম যথার্থই বলেছেন, — "নজরুলের কোন কোন কবিতায় ঈশ্বর, ভগবান, বিধাতা বা স্রষ্টার যে রূপ দৃষ্ট হয় তাতে মনে হয় এ বিধাতা শাসক ও শোষকের প্রতীক, শাসিত শোষিতের সাথে সংগ্রামে তাঁর নিশ্চিত পরাজয় ও ধ্বংসকেই স্রষ্টা-সৃষ্টির দ্বন্দ্বের রূপকে যেন নজরুল প্রকাশ করেছেন।"[৫]

১৯২১ সালে কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ এর উদ্যোগে ও নেতৃত্বে সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। তখন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব মানুষের মধ্যে প্রবলাকার ধারণ করে। ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব মানুষের মধ্যে এমন শক্ত অবস্থান নেয় যে তখন তা সবচেয়ে উদার, প্রগতিশীল রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে পরিগণিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্বেল পরিস্থিতিতে ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গ্রেফতার হয়ে জেলে গেলে তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী 'বাঙ্গলার কথা'র সম্পাদিকার দায়িত্ব নেন। এ 'বাঙ্গলার কথা'য় প্রকাশের জন্য কবিতা চাওয়া হলে নজরুল রচনা করেন 'ভাঙার গান' কবিতাটি। এতে সক্রিয় বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। সাহসী কবির সরাসরি উচ্চারণ—

কারার ঐ লৌহ-কবাট
ভেঙে ফেল্, কর্ রে লোপাট
রক্ত-জমাট
শিকল-পুজোর পাষাণ-বেদী!

(ভাঙার গান/ ভাঙার গান)

উপরিউক্ত কবিতায় কবি দেশপ্রেমিক তরুণদের দেশের মুক্তি সংগ্রামে নির্ভীক দৃঢ়তায় অগ্রসর হবার আহবান জানিয়েছেন। ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের দৈন্যদশায় ব্যথিত কবি কারাগারের ভিত্তি উপড়ে ফেলার সংগ্রামী আহবান জানিয়েছেন উপনিবেশশৃঙ্খলিত ভারতবর্ষের তথা এদেশের মানুষের রাজনৈতিক জীবনের মুক্তির জন্য।

অসহযোগ খেলাফতের যুগের উত্তাল দিনগুলোতে স্বাধীনতার চারণ কবির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আপামর জনসাধারণের পাশে এসে দাঁড়ান নজরুল। ১৯২১ সালেই প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ ভারত ভ্রমণে আসেন। কংগ্রেস সে উপলক্ষে দেশব্যাপী হরতাল আহবান করে। প্রতিবাদ মিছিলে গাইবার জন্য একটি গান রচনা করে দেবার জন্য কুমিল্লার কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নজরুলের কাছে অনুরোধ আসে। নজরুল অনুরোধ রক্ষা করে কুমিল্লা শহরে স্বাধীনতাকামী ছাত্র-জনতার মিছিলের পুরোভাগে হারমোনিয়াম বুকে ঝুলিয়ে শহর পরিভ্রমণের সময় গাইলেন—

ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও!
ফিরে চাও ওগো পুরবাসী,
সন্তান দ্বারে উপবাসী,
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও!

(জাগরণী/ভাঙার গান)

অন্যত্র,

চাই মানবতা, তাই দ্বারে
কর হানি মা গো বারে বারে—
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও!
পুরুষ-সিংহ জাগো রে!
সত্যমানব জাগো রে।

(জাগরণী/ভাঙার গান)

Dhaka University Institutional Repository

কবি এর মাধ্যমে দেশের মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য হিন্দু- মুসলমান নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের প্রতি আকুল আবেদন জানিয়েছেন।

পরাধীন দেশমাতৃকার মুক্তি-চিন্তায় ব্যাকুল নজরুল— নিপীড়িত নির্যাতিতের ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ নজরুল দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার জন্য বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে জনমনে প্রতিরোধের চেতনা জাগিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। কবি সত্য-তেজের আগুন জ্বালিয়ে মানুষের মনে দ্রোহের অবতারণা করতে চেয়েছেন, নির্ভীক বীর সিংহদের জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে স্বদেশী শক্তির জাগরণ ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বিশ্বাসী কবির উচ্চারণ—

পরাধীন ব'লে নাই তোমাদের
সত্য-তেজের নিষ্ঠা কি!
অপমান স'য়ে মুখ পেতে নেবে বিষ্ঠা ছি?

(জাগরণী/ভাঙার গান)

কিংবা,

পুরুষসিংহ জাগো রে!
নির্ভীক বীর জাগো রে!

(জাগরণী/ভাঙার গান)

হুগলী জেলে বন্দী থাকাকালে নজরুল রচিত আরেকটি কবিতার নাম 'সুপার (জেলের) বন্দনা', যা 'ভাঙার গান' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ হুগলী জেলে নজরুল ও তাঁর সহবন্দীদের সঙ্গে জেলের সুপার মিঃ আর্সটিন দুর্ব্যবহার করতেন। বন্দীদের ওপর নিত্য নতুন অত্যাচারের মহড়া চালাতেন। ফলে বন্দীরাও জেল-জুলুমের প্রতিবাদে জেলের আইন ভঙ্গ করতে বাধ্য হন। এ জেল সুপারকে ব্যঙ্গ করে রবীন্দ্রনাথের 'তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে' গানটির প্যারডি করে নজরুল 'সুপার (জেলের) বন্দনা' গান বাঁধেন। খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীনের বর্ণনা থেকে জানা যায়, জেলের রাজবন্দীরা সুপার ও তার সহযোগী কর্মকর্তাদের 'সরকার-সালাম' না জানিয়ে বরং নজরুলের নেতৃত্বে গেয়ে ওঠেন—

তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে, তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমার এ গান তোমারি ধ্যান, তুমি ধন্য ধন্য হে॥

(সুপার (জেলের) বন্দনা/ভাঙার গান)

এতে সুপার ক্রুদ্ধ হয়ে নজরুলকে গাল দিলে নজরুল কথাগুলো হুবহু ফিরিয়ে দেন। ফলে রাজবন্দীদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায় এবং বন্দীদের নির্জন সেলে রাখা হয়। এর ফলে নজরুল অনশন শুরু করেন এবং দেশব্যাপী উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

'দুঃশাসনের রক্ত-পান' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১০ই কার্তিক শুক্রবার ১ম বর্ষের ১৭শ সংখ্যক 'ধূমকেতু'তে 'দুঃশাসনের রক্ত' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। পরে 'দুঃশাসনের রক্ত-পান' শিরোনামে কবিতাটি 'ভাঙার গান' কাব্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। কবিতার নামকরণের মধ্যেই এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ও বক্তব্যের প্রকাশ লক্ষণীয়। ইংরেজ শাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের আহবান জানানো হয়েছে এ কবিতায়। ইংরেজ-অত্যাচারের বিনাশ সাধনই কবির লক্ষ্য—

বল রে বন্য হিংস্র বীর,
দুঃশাসনের চাই রুধির।
চাই রুধির রক্ত চাই,
ঘোষো দিকে দিকে এই কথাই
দুঃশাসনের রক্ত চাই!
দুঃশাসনের রক্ত চাই!!

(দুঃশাসনের রক্ত-পান/ভাঙার গান)

কবি এখানে দেশপ্রেমিক বীরদের 'বন্য' ও 'হিংস্র' বলার মধ্য দিয়ে তাদের সম্মানকে উচ্চাসনে স্থান দিয়েছেন। শব্দ দুটোর সাধারণভাবে প্রচলিত মন্দার্থকে আড়ালে রেখে কবি শব্দ দুটোকে বীরদের অলঙ্কৃত করতে ব্যবহার করেছেন।

ভারতবর্ষ ভারতবাসীদের জন্মস্থান—তাদের মাতৃভূমি। মাতৃভূমিতে যদি নিরাপদে বসবাস করা না যায়, নিজ দেশে যদি হতে হয় পরবাসী তাহলে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কিছু হতে পারে না। তাই নজরুল হাজার হাজার মাইল দূরের শ্বেতাঙ্গ শাসকদের এদেশে অবস্থান সহ্য করতে পারেননি। কারণ তারা এদেশে উড়ে এসে জুড়ে বসে এবং এদেশের মানুষকে জেল-জুলুম-জরিমানা, নির্বাসন, অবজ্ঞা ইত্যাদি বিবিধ পন্থায় শাসন ও শোষণ চালায়। তাদের হাত থেকে শিশু, নারী, পুরুষ কেউ রেহাই পায়নি। কবি ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন এভাবে—

ওরে এ যে সেই দুঃশাসন
দিল শত বীরে নির্বাসন,
কচি শিশু বেঁধে বেত্রাঘাত
করেছে রে এই ক্রূর স্যাঙাত।
মা বোনেদের হরেছে লাজ
দিনের আলোকে এই পিশাচ।

(দুঃশাসনের রক্ত-পান/ভাঙার গান)

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে কবি নজরুল ব্রিটিশ শাসনের বর্বরতার চিত্র তুলে ধরে তার বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাদের ক্ষমা করা ভীরুতা বলে অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন—

হিংসাশী মোরা মাংসাশী,

ভণ্ডামি ভালবাসাবাসি!

শত্রুরে পেলে নিকটে ভাই

কাঁচা কলিজাটা চিবিয়ে খাই!

(দুঃশাসনের রক্ত-পান/ভাঙার গান)

জীবনের ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করে ত্যাগের জীবন বরণ প্রয়োজন। কবিতাটিতে নবীন সংগ্রামীদের যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ের চিত্র প্রকাশিত:

তাহাদের তরে সন্ধ্যা-দীপ,

আমাদের আন্দামান দ্বীপ!

তাহাদের তরে প্রিয়ার বুক

আমাদের তরে ভীম চাবুক।

(দুঃশাসনের রক্ত-পান/ভাঙার গান)

জীবনের ভোগ-বঞ্চিত তরুণদের অল্প বয়সে মৃত্যু, সৈনিক জীবন গ্রহণ, মানবতার ওপর আঘাত, ধর্মাধর্মের অভাব এবং বিপ্লবাত্মক চেতনার দিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত:

ধর্ম-চিন্তা মোদের নয়,

আমাদের নাই মৃত্যু-ভয়!

মৃত্যুকে ভয় করে যারা,

ধর্মধ্বজ হোক তা'রা।

শুধু মানবের শুভ লাগি

সৈনিক যত দুখভাগী।

(দুঃশাসনের রক্ত-পান/ভাঙার গান)

দুঃস্যাহসী কবির নির্ভীকতার চমৎকার উদাহরণ 'দুঃশাসনের রক্ত-পান' কবিতাটি। তেজোদৃপ্ত এ কবিতায় কবি এদেশে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী শাসক ও স্বদেশী কাপুরুষতার প্রতি সরাসরি আঘাত হেনেছেন। কবি

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত সংগ্রামের আহবান জানিয়েছেন রক্তপাতহীন পথে দেশের মুক্তি অসম্ভব বলে।

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর আম্রকাননে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যবাহিনীর সাথে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার সৈন্যবাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের সময় নবাবের প্রধান সেনাপতি মীর জাফর ৫০ হাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। অন্যদিকে মীর মদন, মোহনলাল প্রমুখ নবাবের বিশ্বস্ত সেনা নায়ক ক্লাইভের নেতৃত্বে পরিচালিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যান। দিনান্তে ক্লাইভ যখন রণক্ষেত্র থেকে পলায়নের উদ্যোগ নেয়, তখন নবাবের বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীর জাফর নবাবকে সে দিনের জন্য যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেন। মীর মদন যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হন। মোহনলাল যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও প্রধান সেনাপতির পরামর্শ অনুসারে নবাব সৈন্য নিয়ে পশ্চাদপসরণ করেন। ইংরেজরা এ সুযোগটি পুরোপুরি কাজে লাগায়। আমবাগানের আড়াল হতে ইংরেজ সৈন্যরা বেরিয়ে এসে প্রচণ্ডভাবে কামানের গোলাবর্ষণ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত নবাবের বাহিনী যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং ক্লাইভের বাহিনী জয় লাভ করে। এভাবেই সেদিন বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্ত যায়। নজরুল বলেছেন যে—

ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর।

এবং উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।

(কাণ্ডারী হুঁশিয়ার!/সর্বহারা)

নজরুল কবিতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন যেভাবে রক্তাক্ত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশের স্বাধীনতার সূর্য অস্ত গেছে তেমনি 'আমাদেরি খুনে রাঙিয়া' আবার দেশের স্বাধীনতার সূর্য উদিত হবে।

কবি দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন— পলাশীর প্রান্তরে বাঙালির বুকের রক্তে রঞ্জিত ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হবার ঘটনাকে। কবি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন পলাশীর যুদ্ধের স্মৃতি স্মরণ করে জাতির স্বাধীনতাস্পৃহার পুনরুত্থানের। পলাশীর বেদনা, অপমান, লাঞ্ছনা জাতীয় চিত্তে যেন 'শিখা অনির্বাণ' হয়ে তাকে স্বাধীনতা অর্জনে অনুপ্রাণিত করে। ইংরেজের অধীনতা পাশ থেকে মুক্তি লাভের জন্য, সত্যকে-সুন্দরকে ছিনিয়ে আনার জন্য সুদীর্ঘকালের স্বাধীনতা সংগ্রামে অসংখ্য বীর যোদ্ধার বুকের রক্তে পরাধীনা দেশমাতৃকার চরণ রক্তলাঞ্ছিত হয়েছে। শত বীর যোদ্ধা অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী আততায়ীর হাতে ফাঁসি-কাষ্ঠে প্রাণ হারিয়েছেন। সেসব বীর যোদ্ধারা মরেও অমর। হাসিমুখে মরণকে বরণের মাধ্যমে জীবনের সীমাহীন জয়গান উচ্চারিত হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সংকল্পে অনুপ্রাণিত হয়ে যেসব বীর যোদ্ধা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁরা আজ তাঁদের স্বপ্নের পূর্ণ বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রতীক্ষারত। কবির ভাষায়—

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,

আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান?

(কাণ্ডারী হুঁশিয়ার!/সর্বহারা)

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের ওপর স্রষ্টা সর্ব রঙ ও রূপের মানুষকে সমান অধিকার দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোন প্রকার ভেদাভেদ নেই। কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদ আর অন্ধ বর্ণাভিমান মানুষকে চরম অত্যাচারী, নির্মম করে মানবতার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে। এক্ষেত্রে শ্বেত বর্ণের অর্থাৎ শ্বেতদ্বীপের মানুষ মনে করে যে, চন্দ্র-সূর্য কেবল শ্বেতদ্বীপেই আলো জোগাবে, অন্য কোথাও নয়। উগ্র বর্ণাভিমানী শ্বেতমানবগোষ্ঠী মনে করে সারা বিশ্বে শাসন করার একচ্ছত্র অধিকার তাদের ওপরই ন্যস্ত। এ ধারণা শ্বেতাঙ্গদের আগ্রাসী-বৃত্তিকে উত্তেজিত করে, পরিণামে সংঘটিত হয় বিশ্ব জুড়ে শ্বেত সাম্রাজ্যবাদের প্রসারণ। এভাবেই তারা সৎবৃত্তির পরিচর্যা থেকে দূরে সরে এসে স্রষ্টাকে অপমান, অসম্মান করায় রত। 'আদি-পিতা ভগবানে'র নিকট অভিযোগের সুরে কবির সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে ঘৃণার প্রকাশ—

শ্বেত, পীত, কালো করিয়া সৃজিলে মানবে, সে তব সাধ।
আমরা যে কালো তুমি ভাল জান, নহে তাহা অপরাধ!
তুমি বল নাই, শুধু শ্বেতদ্বীপে
জোগাইবে আলো রবি-শশী-দীপে,
সাদা র'বে সবাকার টুটি টিপে, এ নহে তব বিধান।
সন্তান তব করিতেছে আজ তোমার অসম্মান!
ভগবান! ভগবান!

(ফরিয়াদ/সর্বহারা)

স্রষ্টা মানুষকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে দৈহিক সক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বরদত্ত মানুষের এ দৈহিক সক্ষমতাকে খর্ব করার অধিকার কেউ রাখে না। একইভাবে এ বিশ্বে মানুষ স্বাধীনভাবে বিচরণের অধিকারও প্রাপ্ত হয়েছে। যেকোন মানুষ বিশ্বের যেকোন স্থানে অবাধে বিচরণের অধিকার রাখে। এতে বাধা প্রদানের অধিকার কারো নেই। কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বে মানুষের স্বাধীন বিচরণের অধিকার খর্ব করা হয়। ইংরেজ সরকার ভারতবাসীবিদ্বেষী আইন করে মানুষের স্বাধীনভাবে চলাফেরার ওপর নজরদারী- খবরদারী এবং নিবর্তনমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে। এর বিরুদ্ধে স্রষ্টার কাছে প্রশ্নাকারে নজরুলের প্রতিবাদ—

তোমার দত্ত হস্তরে বাঁধে কার নিপীড়ন- চেড়ী?
আমার স্বাধীন বিচরণ রোধে কার আইনের বেড়ি?
ক্ষুধা তৃষা আছে, আছে মোর প্রাণ,
আমিও মানুষ, আমিও মহান্!
আমার অধীন এ মোর রসনা, এই খাড়া গর্দান!
মনের শিকল ছিঁড়েছি, পড়েছে হাতের শিকলে টান—
এতদিনে ভগবান।

(ফরিয়াদ/সর্বহারা)

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ধৃত অংশে কেবল রাজনৈতিক শৃঙ্খলের বিরুদ্ধেই নয়, মনোজগতের শৃঙ্খলের বিরুদ্ধেও নজরুলের বিদ্রোহের প্রাবল্য সংলক্ষ্য।

নজরুল 'শিল্পের জন্য শিল্প'— কর্ম রচনা করেননি। কবি নজরুল শিল্পকে নান্দনিকতার কল্পলোকের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করেছেন, জীবনের জয়গান উচ্চারণ করেছেন। তিনি 'ব্রিটিশ খেদাও' বলে জনযুদ্ধ শুরু করার জন্য তাঁর রচনাকর্মের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তাঁর রচিত সাহিত্য সমালোচকদের কাছে, রোমাণ্টিক বিলাসীদের কাছে, কলাকৈবল্যবাদীদের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলেও দেশবাসীকে বিপ্লবী আন্দোলনে প্রেরণা দান করার অভিযোগে, ইংরেজ বিদ্বেষ ও রাজবৈরিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে। যেহেতু দেশের মুক্তি সংগ্রামই ছিল কবির প্রধান উদ্দেশ্য সেহেতু তাঁর সাহিত্যকর্ম ইংরেজ সরকারের গাত্র দাহের সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রচনা ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। বক্তব্যের সমর্থনে নজরুলের উক্তি স্মরণযোগ্য—

বন্ধু! তোমরা দিলে না ক' দাম,
রাজ-সরকার রেখেছেন নাম।
যাহা কিছু লিখি অমূল্য ব'লে অ-মূল্যে নেন! আর কিছু
শুনেছ কি, হুঁ হুঁ, ফিরিছে রাজার প্রহরী সদাই কার পিছু?

(আমার কৈফিয়ত/সর্বহারা)

মহাত্মা গান্ধীর ব্যর্থতায় পর্যবসিত অহিংস নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক উচ্চারণ নজরুলের 'সব্যসাচী' কবিতা। এখানে মহাভারতের পুরাকাহিনীর অবতারণা করে দেশবাসীকে আশার জীবনী শক্তিতে জাগ্রত করার প্রয়াস পেয়েছেন কবি। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহবাদের রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করা যায় এ কবিতায়। বিরাট কালের অজ্ঞাতবাস ভেদ করে পার্থের জাগরণের মধ্য দিয়ে যেমন পাণ্ডবদের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল, তেমনি নজরুল সুদীর্ঘকাল পরে নবযৌবনের আবির্ভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নব প্রাণ সঞ্চারিত হবার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। কারণ 'ফাঁসির মঞ্চে কারার বেত্রে' ভারতবাসী অভ্যস্ত হয়ে প্রতিবাদী চরিত্র লাভ করেছে। অতএব 'এই উৎপীড়নের দেনা' কেউ শুধাবে না তা হতে পারে না। কারণ হিসেবে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন প্রকৃতির অনিবার্যতার দিকে। কালের চাকা বিরতিহীনভাবে ঘুরছে। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে আজকের সম্রাট কাল বন্দী, কুটিরে আবির্ভাব ঘটে রাজার প্রতিদ্বন্দ্বীর। কংসের কারাগারে তাঁর হত্যাকারী জন্মলাভ করে। যাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে পদাঘাত করা হয় তারই বক্ষ বিদীর্ণ করে নৃসিংহের আবির্ভাব অর্থাৎ পদানতদের মধ্য থেকে শক্তির অভ্যুত্থান ঘটে। অত্যাচারীর অত্যাচার, শোষকের শোষণ, শাসকের দুঃশাসনের পরিণাম তারই ওপর বর্তায়, তারই পতনের পথকে প্রশস্ত করে। কবি এ কবিতায় এ জাতীয় বক্তব্যের ভেতর দিয়ে যে ব্রিটিশ রাজত্বের ভবিষ্যতের কোন্ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করেছেন তা সহজেই অনুমেয়।

কবি নজরুল পৌরাণিক চিত্রকল্পে সতীকে স্বাধীনতারূপে প্রতীকায়িত করেছেন। সতীকে যে মৃত্যু বরণে বাধ্য করায় অর্থাৎ স্বাধীনতাকে যে বিনষ্ট করে সেই অত্যাচারী, অমঙ্গল শক্তি সত্যিকার অর্থে নিজের

Dhaka University Institutional Repository

বিনাশের পথই রচনা করে। এ বিনাশ সাধিত হয় অবিনাশী কল্যাণ আর মঙ্গলের হাতে। নজরুল পৌরাণিক চরিত্র সব্যসাচীকে শৌর্যবীর্য, উদাত্ততা আর মহত্ত্বের প্রতীক হিসেবে নিয়েছেন।

নজরুল সব্যসাচী চরিত্রের প্রতীকটিকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেছেন। ঝিমিয়ে আসা গতিহীন স্বাধীনতা আন্দোলনকে চাঙা করার জন্য, গতিশীলতা দানের জন্য নবযুগ সেনাপতি সব্যসাচীকে কবি আহবান জানিয়েছেন। একটা পর্যায়ে নজরুল অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতায় চরকায় সুতো কাটা ইত্যাদি অহিংস কর্মপদ্ধতির ওপর আস্থা হারিয়ে বিপ্লববাদের ওপর অধিকতর আস্থাশীল হয়ে ওঠেন। 'তাই ফাল্গুনীকে তিনি আহবান করেছেন জাতিকে সশস্ত্র বিপ্লবের দীক্ষা দিতে।'[৬] অহিংস আন্দোলনের শান্তিবাহিনীকে তিনি তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করেছেন। তাঁদের নেতৃত্বে যখন দেশের মুক্তি আন্দোলন অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে, নেতৃত্ব দেশপ্রেমের সৌখিন অভিনয় করে চলেছে তখন কবি বাংলার বিপ্লবী নওজোয়ানদের আহবান করেছেন, ভুয়ো শান্তির ঘুম-পাড়ানি গান বন্ধ করে জেগে উঠতে। কারণ ইতোমধ্যে অনেক আত্মোৎসর্গ করা হয়েছে, কিন্তু—

দানব-দৈত্য তবু মরে নাই,

(সব্যসাচী/ফণি-মনসা)

সেজন্য অহিংস আন্দোলনের প্রতীক চরকাকে অবলম্বন করে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়, স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন সশস্ত্র সংগ্রাম— এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী কবি নবীন প্রাণময়তার মন্ত্রে জাতিকে, বিশেষ করে তরুণ প্রাণকে উদ্বোধিত হওয়ার আহবান জানিয়েছেন—

সূতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, বসে বসে কাল গুণি!
জাগোরে জোয়ান! বাত ধরে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি'!

(সব্যসাচী/ফণি-মনসা)

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনে নেতৃত্বের ব্যর্থতা, হঠকারিতা, পৌরুষহীনতা, জাতিগত সম্প্রীতির অভাব যেভাবে স্বাধীনতা অর্জনের সম্ভাবনাকে অনিশ্চিত করে তুলেছে তার সমাধান হিসেবে নজরুল মহাবলশালী বীর্যবত্তার প্রতীক সব্যসাচী অর্জুনের আবির্ভাবকে বিবেচনা করেছেন। শৌর্যবীর্য ও বলিষ্ঠতার মন্ত্রে দেশকে উজ্জীবনের জন্য সব্যসাচীর আবির্ভাব কামনা করেছেন নজরুল—

দক্ষিণ করে ছিঁড়িয়া শিকল, বাম করে বাণ হানি'
এস নিরস্ত্র বন্দীর দেশে হে যুগ-শস্ত্রপাণি!
পূজা ক'রে শুধু পেয়েছি কদলী,
এইবার তুমি এস মহাবলী।
রথের সুমুখে বসায়ো চক্রী চক্রধারীরে টানি',
আর সত্য সেবিয়া দেখিতে পারি না সত্যের প্রাণহানি।

(সব্যসাচী/ফণি-মনসা)

Dhaka University Institutional Repository

সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণে জর্জরিত মানুষের জ্বালা-যন্ত্রণা-ক্লেশ, সারা দেশ জুড়ে কেবল অত্যাচার, নিঃসঙ্গতা, হতাশা নজরুলকে ভয়ানকভাবে বিচলিত ও ব্যথিত করে। তাই নজরুল মহাভারতের আদর্শ যোদ্ধা সব্যসাচীর সাহায্য প্রার্থনা করে বিরোধাভাসের মধ্য দিয়ে পরাধীনতার যন্ত্রণা থেকে প্রকৃত মুক্তি পেতে চেয়েছেন। তাঁর আবেদন—

বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সব্যসাচী,
যা হোক একটা দাও কিছু হাতে, একবার ম'রে বাঁচি!

(সব্যসাচী/ফণি-মনসা)

হুগলিতে ১৩৩১ সালের মাঘ মাসে নজরুল 'বন্দিনী' কবিতাটি রচনা করেন। এটি 'বিজলী'তে মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত এবং 'ফণি-মনসা' গ্রন্থে 'দ্বীপান্তরের বন্দিনী' নামে সংকলিত। এ কবিতায় বিদেশী কুশাসনে ভারত-ভারতী মা'র অসহায় অবস্থার চিত্র বর্ণনার ভেতর দিয়ে ভারত-ভারতী মা'র দ্বীপান্তরের বেদনা অঙ্কিত হয়েছে। কবির কল্পনায় সাত সমুদ্র তের নদী পারে আন্দামানে দেশপ্রেমিক বীর সন্তানদের দ্বীপান্তর প্রকৃতপক্ষে ভারত মাতারই দ্বীপান্তর। এখানে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের মাটিতে ভারত মাতার সন্তান 'নিজ দেশে পরবাসী', কারণ 'মুক্ত ভারতী' ভারতে নেই। এখানে মানুষকে গোলাম করে রাখা হয়েছে। কবি তাই ভারত মাতার পূজারীদেরকে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে জীবনের মহা আহবান ঘোষণার তাগিদ দিয়েছেন। কবির ভাষায়—

তবে তাই হোক। ঢাল অঞ্জলি,
বাজাও পাঞ্চজন্য শাঁখ!
দ্বীপান্তরের ঘানিতে লেগেছে
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাক!

(দ্বীপান্তরের বন্দিনী/ফণি-মনসা)

'মুক্তি-কাম' কবিতায় কবি দুর্বল, ভীত, শোষিত মানুষের প্রাণশক্তির উন্নয়ন-লক্ষ্যে অন্তর্লোকের দীপশিখা জ্বালাবার গুরুত্ব ব্যক্ত করেছেন। কবি বলছেন মার খেয়ে খেয়ে যারা অভ্যস্ত তাদের মারের ভয় থাকতে পারে না। রাতের কালো অন্ধকারের অবসান হয়ে দিনের আলো জ্বলবে। তিনি বলছেন, আমাদের দেহে জীবন অনুপস্থিত। কেবল কঙ্কালই আছে বাকি। সিন্ধু-শকুন আমাদের দেহে জীবনের সাড়া নেই দেখে আমাদের মৃত্যুৎসব করছে। কিন্তু আমরা যদি এটুকু মনে করতে পারি যে, আমরা 'মরে নেই'— 'বেঁচে আছি' তাহলেও হয়ত সিন্ধু-শকুন ভয়ে দূরে পালাবে। কবি এখানে ভেঙ্গে পড়া মানসিকতাকে চাঙ্গা করতে অর্থাৎ হীনমন্যতাকে দূরীভূত করার প্রয়াস পেয়েছেন সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের প্রয়োজনে। তাঁর ভাষায়—

রক্ত-মাংস খেয়েছে তোদের, কঙ্কাল শুধু আছে বাকি,
ঐ হাড় নিয়ে উঠে দাঁড়া তোরা "আজো বেঁচে আছি" বল্ ডাকি!
জীবনের সাড়া যেই পাবে, ভয়ে সিন্ধু-শকুন পালাবে দূর,
ঐ হাড়ে হবে ইন্দ্র-বজ্র, দগ্ধ হবে রে বৃত্রাসুর!

(মুক্তি-কাম/ফণি-মনসা)

Dhaka University Institutional Repository

শরদিন্দু রায় নজরুলের সমসাময়িক একজন কবি। নজরুলের সঙ্গে তাঁর ভালো পরিচয় ছিল বলে ধারণা করা হয়। ১৯২৩ সালে যক্ষ্মারোগে তাঁর অকালে মৃত্যু হয়। এ সময় নজরুল ছিলেন বহরমপুর জেলে বন্দী। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে জেলে বসেই নজরুল 'ইন্দু-প্রয়াণ' কবিতাটি রচনা করেন।[৭]

কবিতাটির শুরুতে শরদিন্দুর উদ্দেশ্যে শোক জ্ঞাপন করতে গিয়ে নজরুল লিখেছেন—

বাঁশির দেবতা! লভিয়াছ তুমি হাসির অমর-লোক,
হেথা মর-লোকে দুঃখী মানব করিতেছি মোরা শোক!

(ইন্দু-প্রয়াণ/ফণি-মনসা)

মাতৃভূমির মুক্তি চিন্তা নজরুলকে এমনভাবে পেয়ে বসে যে শরদিন্দুকে স্মরণ করে এ কবিতা লিখলেও স্বদেশের পরাধীনতার গ্লানি, জ্বালা ও যন্ত্রণার কথা কবিতাটিতে যেন অনিবার্যভাবেই এসে গেছে। তাই তাঁর মৃত্যুতে শোক ও শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে নজরুল বলেছেন, একদিক থেকে ভালই হয়েছে যে শরদিন্দু পরাধীন দেশ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। কারণ, পরাধীন দেশ কারাগার তুল্য— এ বেদনাবোধ তাঁর মধ্যে ক্রিয়া করে। পরাধীন দেশে সত্য কথা উচ্চারণ করা যায় না। আর সত্য কথা বলার সুযোগ যেদেশে নেই সেদেশ শরদিন্দুর মত কবির সত্য-সুন্দরের চর্চার ক্ষেত্র ও তাঁর বাসস্থান হতে পারে না। এখন বিধি নিষেধের সীমা অতিক্রম করে যেখানে তিনি গেছেন সেখানে শাসনে তাঁর বাণী রুদ্ধ নয়—

ভালই করেছ ডিঙিয়া গিয়াছ নিত্য এ কারাগার,
সত্য যেখানে যায় না ক' বলা, গৃহ নয় সে তোমার।

(ইন্দু-প্রয়াণ/ফণি-মনসা)

রফিকুল ইসলাম যথার্থই বলেছেন, "শরদিন্দু রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে স্বদেশের পরাধীনতায় বেদনার প্রকাশই মুখ্য।"[৮] শরদিন্দু ছিলেন নজরুলের মতই সমাজ সচেতন ও সংগ্রামী কবি। নজরুল তাই এ কবিতায় নিজেকে শরদিন্দুর 'ভক্ত' বলে উল্লেখ করেছেন এবং মৃত্যুর পরে তাঁর সাথে থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। "শরদিন্দুর অকাল মৃত্যুতে তাঁর প্রতি শোক ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সুযোগে নজরুল স্বদেশের পরাধীনতার বেদনা পুনর্ব্যক্ত করেছেন।"[৯] বলা বাহুল্য, এ বেদনার প্রকাশ ঘটেছে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের অনুষঙ্গে।

১৯২৬ সালে ইংল্যান্ডে এক সাধারণ ধর্মঘট হয়। এ ধর্মঘটের ঘটনাকে নজরুল ইংরেজ সাম্রাজ্যের ধ্বংসের আলামত হিসেবে নিয়েছেন। প্রবল প্রতাপশালী যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কখনো সূর্য অস্ত যায় না সে দেশে ধর্মঘটে নজরুলের কাছে এটা স্পষ্টতঃ উপলব্ধ হয়েছে যে, এ ঘটনা সুবিশাল ইংরেজ সাম্রাজ্যের পতনেরই পূর্বাভাস। রোম, গ্রীক সাম্রাজ্যের মতই একই পথ ধরে ঔপনিবেশিক ভূগোলের সেই বহু কথিত অ-অস্তক সূর্য ডোবার দিন সমাগত। নজরুল তাই লিখেছেন—

Dhaka University Institutional Repository

রাজ্যে যাদের সূর্য অস্ত যায় না কখনো, শুনিস্ হায়,
মেরে মেরে যারা ভাবিছে অমর, মরিবে না কভু মৃত্যু- ঘায়,
তাদের সন্ধ্যা ঐ ঘনায়!

(যা শত্রু পরে পরে/ফণি-মনসা)

তথাকথিত সভ্য জাতি ইংরেজরা এদেশে প্রভু সেজে 'নেটিভ'দের বা স্থানীয় অধিবাসীদের ভৃত্যের স্তরে নামিয়েছে। ইংরেজরা এদেশে নির্মমভাবে শাসন-শোষণ করেছে, নৃশংসতায় মানুষকে নির্যাতন করেছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসন এবং শোষণে যে লোভের আগুন তারা জ্বালিয়েছে সে আগুনে খোদ ব্রিটিশদেরই পুড়ে মরার উপক্রম হয়েছে। তাই ইংল্যান্ডের মাটিতে ধর্মঘটের ন্যায় সরকার বিরোধী তৎপরতায় নজরুল বলেছেন—

তাদের সে লোভ-বহ্নিশিখ্
জ্বালায়ে জগৎ, দিগ্বিদিক,
ঘিরেছে তাদেরি গৃহ, সাবাস!
যে আগুনে তা'রা জ্বালাল ধরা তা এনেছে তাদেরি সর্বনাশ!
আপনার গলে আপন ফাঁস!

(যা শত্রু পরে পরে/ফণি-মনসা)

ঘরের শত্রু যখন বিভীষণ নজরুল মনে করেছেন এমন সুযোগেই শত্রুকে ঘায়েল করা উচিত। কারণ লক্ষ্যার্জনের এটাই উপযুক্ত সময়। তাই তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভারতবাসীকে ডাক দিয়েছেন এই বলে যে, —

ঘর সাম্‌লে নে এই বেলা তোরা ওরে ও হিন্দু-মুস্‌লেমিন!
আল্লা ও হরি পালিয়ে যাবে না, সুযোগ পালালে মেলা কঠিন!
ধর্ম-কলহ রাখ্ দু'দিন!

(যা শত্রু পরে পরে/ফণি-মনসা)

ধর্ম-কলহ সাময়িকভাবে হলেও তার পরিবর্তে দেশোদ্ধারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন কবি, ব্যক্ত করেছেন স্বাধীনতার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা।

১৯২৬ সালের এপ্রিল থেকে জুলাই মাসের মধ্যে সংঘটিত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় কলকাতায় প্রায় ১৩৮ জন লোক নিহত হয়। একই বছরে ঢাকা, পাটনা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। তৎকালীন যুক্তপ্রদেশে চরমভাবে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয় এবং ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় সর্বাধিক। এ সময়কালেই অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে (৯ আশ্বিন ১৩৩৩) নজরুল 'হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ' কবিতাটি রচনা করেন। কবিতাটি 'ফণি-মনসা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতায় কবি সাম্প্রদায়িকতার প্রতি ব্যঙ্গ প্রকাশ করেছেন। যে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনাগ্রহী, পরাধীনতার জগদ্দল পাথর বুকের ওপর থেকে সরাতে যারা ব্যর্থ তারাই পরস্পর পরস্পরকে আঘাত হানতে অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনা দেখাচ্ছে। যে দু' সম্প্রদায় দীর্ঘকাল ধরে ইংরেজের সব অত্যাচার সব অপমান নীরবে সহ্য করেছে তারাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে একে অপরকে আঘাত হানছে। ভীরু কাপুরুষদের এ কার্যকলাপ নজরুলের কাছে অত্যন্ত হাস্যকর মনে হয়েছে। এ দু' বিবদমান সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতার পথে গণ জাগরণকে নজরুল নিম্নোক্তভাবে ব্যঙ্গ করেছেন—

মাভৈঃমাভৈঃ! এতদিনে বুঝি জাগিল ভারতে প্রাণ,
সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ শ্মশান-গোরস্থান!
ছিল যারা চির-মরণ-আহত,
উঠিয়াছে জাগি' ব্যথা-জাগ্রত,
'খালেদ' আবার ধরিয়াছে অসি, 'অর্জুন' ছোঁড়ে বাণ।
জেগেছে ভারত, ধরিয়াছে লাঠি হিন্দু-মুসলমান!

(হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ/ফণি-মনসা)

ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব প্রকাশ করলেও এ দাঙ্গার ইতিবাচক দিকটা নজরুলের দৃষ্টি এড়ায়নি। আশাবাদী কবি মনে করেছেন দুটো সম্প্রদায়ের পারস্পরিক দাঙ্গার মধ্য দিয়ে ভারতে প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে। কবি মনে করেছেন হিন্দু-মুসলমানের এ লাঠি ধরার মধ্য দিয়ে ভারতের জাগরণ ঘটেছে। বিদেশী শক্তিকে এদেশ থেকে তাড়াবার জন্য ভবিষ্যতে যে সংগ্রামের প্রয়োজন হবে এ হাঙ্গামা যেন তারই প্রস্তুতি স্বরূপ। এ পরীক্ষামূলক যুদ্ধ বা 'মক্ ফাইট'-এর মাধ্যমে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার যোগ্যতা অর্জিত হবে এবং ভবিষ্যৎ-বিপ্লবের জন্য যোগ্য বীর সেনানী নির্বাচন করা সহজ হবে। সেজন্য নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে শক্তির জাগরণ হোক, যে শক্তি পরবর্তীতে ইংরেজ শত্রুকে হননের কাজে ব্যবহৃত হবে। কবি বলছেন—

যে-লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, পড়ে মন্দির-চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ গুঁড়া!

(হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ/ফণি-মনসা)

অতএব 'করুক কলহ— জেগেছে তো তবু'— তাই কবি ভারতবাসীকে 'বিজয়-কেতন' ওড়াবার উৎসাহ যুগিয়েছেন।

নজরুল ইসলামের 'জিঞ্জীর' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে। এ গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতির কবিতা 'নকীব'। এ কবিতায় কবি ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে জড়তাগ্রস্ত, দুর্বল, হতদরিদ্র, নির্যাতিত মানুষকে নব জীবনের মন্ত্রে উজ্জীবিত করতে নেতৃত্বের আহবান জানিয়েছেন। আহবান জানিয়ে তিনি বলেছেন—

Dhaka University Institutional Repository

নব-জীবনের নব-উত্থান-আজান ফুকারি' এস নকীব।

জাগাও জড়! জাগাও জীব!

জাগে দুর্বল, জাগে ক্ষুধা-ক্ষীণ

জাগিছে কৃষাণ ধুলায়-মলিন,

জাগে গৃহহীন, জাগে পরাধীন

জাগে মজ্‌লুম বদ্‌-নসীব!

(নকীব/জিঞ্জীর)

কৃষ্ণনগরে ১৩৩৩ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ (ডিসেম্বর, ১৯২৬ খ্রীঃ) নজরুল রচনা করেন 'খালেদ', কবিতাটি বার্ষিক 'সওগাত' (১৩৩৩ সাল) পত্রিকায় প্রকাশিত ও 'জিঞ্জীর' (প্রকাশ নভেম্বর, ১৯২৮ খ্রীঃ) গ্রন্থে সংকলিত।[১০]

বীর যোদ্ধা খালেদের বীরত্ব, সংগ্রামশীলতা ও আনুগত্য নজরুলকে আকৃষ্ট করেছে। তিনি তাঁকে অর্জুনের ন্যায় বীরত্বের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তৎকালীন ভারতের ঘুমন্ত ও অধঃপতিত মুসলমানদের সামনে খালেদের সংগ্রামী চরিত্র তুলে ধরাই ছিল 'খালেদ' কবিতা রচনার আসল উদ্দেশ্য। পরাধীন বঙ্গভারতের ন্যুব্জকুব্জ মুসলমানদের মধ্যে খালেদের গুণাবলি অর্জনের প্রেরণা সঞ্চার করতে চেয়েছেন। নজরুল যথার্থই বুঝতে পেরেছিলেন অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বীরোচিত সংগ্রাম ছাড়া শান্তি অর্জন অসম্ভব। খালেদ বহু অত্যাচারী শাসকের পতন ঘটিয়ে মানুষকে মুক্তি দিয়েছেন। অতএব পশ্চাদপদ, হীনবীর্য ও উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত বঙ্গভারতীয় মুসলমানদের মধ্যেও খালেদের মত বীরপুরুষের আগমন ঘটুক এ কামনা করেছেন কবি। তাঁর দৃষ্টিতে খালেদ মুসলমানদের এবং একইসঙ্গে সারা বিশ্বের মজলুম মানুষের মুক্তিদাতা।

নজরুল শ্বেত সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদকে 'সফেদ দেও' বা 'শ্বেত দানব' বলে উল্লেখ করেছেন। বীর যোদ্ধা খালেদের সামনে যে শক্তি টিকে থাকতে পারেনি সে পর্যায়ের শক্তির কাছে ভারতবর্ষের মানুষ আজ পর্যুদস্ত। কবি বলেছেন—

খালেদ! খালেদ! সত্য বলিব, ঢাকিব না আজ কিছু,

সফেদ দেও আজ বিশ্ববিজয়ী, আমরা হটেছি পিছু!

(খালেদ/জিঞ্জীর)

এর কারণ হিসেবে নজরুল বলেছেন—

খালেদ! খালেদ! লুকাব না কিছু, সত্য বলিব আজি,

ত্যাগী ও শহীদ হওয়া ছাড়া মোরা আর সব হ'তে রাজি!

(খালেদ/জিঞ্জীর)

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল মুসলমান সমাজে বীরত্বের জাগরণ ঘটাতে চেয়েছেন। তার জন্য তলোয়ার হাতে বীর খালেদের মত নেতার প্রয়োজন। মুসলমানদের মধ্যে তিনি সে ধরণের নেতার আবির্ভাবই কামনা করেছেন। নিম্নোদ্ধৃত অংশে এ কামনার প্রকাশ ঘটেছে—

খোদার হাবিব বলিয়া গেছেন আসিবেন ঈসা ফের,

চাই না মেহ্দী, তুমি এস বীর হাতে নিয়ে শম্শের।

(খালেদ/জিঞ্জীর)

খালেদকে স্মরণ করে কবিতাটি রচিত হয়েছে মাত্র, আসল উদ্দেশ্য ছিল কবির স্বদেশের নিস্তেজ, মৃতপ্রায় মুসলমানদেরকে জাগ্রত করা। স্বদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অজ্ঞানতা, ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের উর্ধ্বে উঠে মুসলমানরাও যাতে অংশ নিতে পারে, বীর বিক্রমে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসে সে প্রেরণা সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাই কবিতাটিতে ব্যক্ত হয়েছে।

'চিরঞ্জীব জগ্লুল' কবিতাটি ১৩৩৪ সালের ১৬ই ভাদ্র (সেপ্টেম্বর, ১৯২৭) তারিখে কৃষ্ণনগরে রচিত এবং 'নওরোজ' পত্রিকায় ঐ বছরের, ভাদ্র সংখ্যায়, প্রকাশিত ও 'জিঞ্জীর' কাব্যে সংকলিত। মিসরের জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী নেতা জগ্লুল পাশা সাদ ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে আগস্ট তারিখে পরলোক গমন করেন, তাঁর মৃত্যুতেই এ কবিতাটি রচিত।'[১১]

এ কবিতায় কবি জগলুল পাশাকে শুধু মিসরের নয়— সারা বিশ্বের নির্যাতিতের মুক্তিকামী চিরঞ্জীব নেতারূপে বর্ণনা করেছেন, তাঁর সংগ্রামশীল জীবনের পরিচয় তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জন্যে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি কবি তাঁর নিজ দেশের পরাধীনতার কথাও ব্যথিত চিত্তে প্রকাশ করে তাঁর দেশেও জগ্লুলের মত সংগ্রামী নেতার আবির্ভাবের স্বপ্ন দেখেছেন।

মিসরের 'শের, শির, শম্শের' জগ্লুল পাশার মৃত্যুতে মিসরে যেন শূন্যতার বিপ্লাবন— মিসরের মানুষ শোকে মুহ্যমান। প্রকৃতিতে এমনকি মিসরের আকাশে, বাতাসে যেন শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কবির দৃষ্টিতে এ যেন রোজ-কেয়ামত।

কিছুদিন পূর্বে সুদান হারিয়ে মিসরিরা শোকাচ্ছন্ন হলেও জগ্লুলকে তাদের মাঝে পেয়ে সুদান হারাবার শোক ভুলে গিয়েছিল—

মিসরে খেদিব ছিল বা ছিল না, ভুলেছিল সব লোক,

জগলুলে পেয়ে ভুলেছিল ওরা সুদান-হারার শোক।

(চিরঞ্জীব জগ্লুল/জিঞ্জীর)

সোহরাবের সঙ্গে যুদ্ধে রুস্তমের যে বীরত্ব এবং ফেরাউনের সঙ্গে যুদ্ধে মুসার (আঃ) যে কৌশল সেই একই বীরত্ব এবং কৌশলের পরিচয় জগ্লুল দিয়েছেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে। তাঁর মৃত্যুতে মিসরের বীরত্ব ও যৌবন অবসিত হয়েছে—

Dhaka University Institutional Repository

রহিল মিসর, চ'লে গেল তার দুর্মদ যৌবন,
রুস্তম গেল, নিষ্প্রভ কায়খসরু-সিংহাসন।

(চিরঞ্জীব জগ্‌লুল/জিঞ্জীর)

অথবা,

'ফেরাউন' ডুবে না মরিতে হায় বিদায় লইল মুসা,

(চিরঞ্জীব জগ্‌লুল/জিঞ্জীর)

এবং

ফেরাউন মোরা দেখিনি, দেখেছি নিপীড়ন ফেরাউনী।

(চিরঞ্জীব জগ্‌লুল/জিঞ্জীর)

এ কবিতায় 'ফেরাউন' বলতে কবি ব্রিটিশ সরকারকে এবং 'ফেরাউনী' বলতে ব্রিটিশ সরকারের শাসনকে বুঝিয়েছেন।

নজরুল এ মহান নেতার নীতি-দর্শন ও শিক্ষার প্রতি স্বদেশের (বঙ্গ-ভারতের) মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। এ দেশের মানুষ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রভাবের মধ্যে বন্দী থেকেছে এবং আত্মকলহে শক্তি ক্ষয় করেছে। কবি তাই স্বদেশের মুক্তির জন্য, স্বদেশের সার্বিক কল্যাণের জন্য জগ্‌লুলের আশীর্বাদ কামনা করে তাঁর দেশেও জগ্‌লুলের মত অগ্রনায়কের আবির্ভাব ঘটুক এ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন।

মলয়-শীতলা সুজলা এ দেশে— আশিস করিও খালি—
উড়ে আসে যেন তোমার দেশের মরুর দু'মুঠো বালি।

(চিরঞ্জীব জগ্‌লুল/জিঞ্জীর)

কবিতার শেষ স্তবকে এসে কবি মিসরের প্রাচীন ইতিহাস উল্লেখ করে ব্রিটিশ শাসকদের 'ফেরাউন', 'দজ্জাল' ও জগ্‌লুলকে 'মুসা' রূপে অভিহিত করেছেন। প্রাচীন আমলের অত্যাচারী 'ফেরাউন' রাজগণের মতই বর্তমানের অত্যাচারী ব্রিটিশ শক্তির পতন হবার আশাবাদ ব্যক্ত করে কবি বলেন—

মিসর হইতে বিদায় লইল মুসা যবে চিরতরে,
সম্ভ্রমে স'রে পথ ক'রে দিল 'নীল' দরিয়ার বারি,
পিছু পিছু চলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মিসরের নরনারী,
শ্যেন-সম ছোটে ফেরাউন-সেনা ঝাঁপ দিয়া পড়ে স্রোতে,
মুসা হ'ল পার, ফেরাউন ফিরিল না 'নীল' নদী হ'তে।
তোমার বিদায়ে করিব না শোক, হয় ত দেখিব কা'ল
তোমার পিছনে মরিছে ডুবিয়া, ফেরাউন দজ্জাল!

(চিরঞ্জীব জগ্‌লুল/জিঞ্জীর)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পরাধীন আফগানিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে আমানুল্লাহ্ খানের নেতৃত্বে। তিনি ভারত সফরে এলে নজরুল তাঁকে উদ্দেশ্য করে 'আমানুল্লাহ্' শীর্ষক কবিতাটি রচনা করেন। এটি 'সওগাতে' মাঘ ১৩৩৪ (জানুয়ারী ১৯২৮ খ্রীঃ) প্রকাশিত এবং পরবর্তীকালে 'জিঞ্জীর' কাব্যে সংকলিত।'[১২]

পরাধীন দেশের মানুষ হয়ে কবি স্বাধীন দেশের বাদশাহ্ আমানুল্লাহ্কে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে তাঁর নিজ দেশের পরাধীনতার বেদনায় ও লজ্জায় বিব্রত হয়েছেন, সংকুচিত হয়েছেন এবং একই সঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি নিজ দেশের মানুষের নির্লিপ্ততা, কাপুরুষতা ও হীনবীর্যতায় বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাঁর স্বদেশ—ভারত ভূমিকে তিনি 'পশুর কতল্গাহ্' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে এ পরাধীন দেশের মানুষ লজ্জায় সংকুচিত, স্বাধীন দেশের বাদশাহ্কে সংবর্ধনা জানানোর কোন অধিকার তাদের নেই। কবিতার শুরুতেই তিনি আমানুল্লাহ্কে অভিনন্দন জানিয়ে পরাধীন স্বদেশ ভূমির বেদনাময় চিত্র তুলে ধরেছেন—

খোশ্ আম্দেদ আফ্গান-শের!— অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে আজ—
সালাম জানায় মুসলিম-হিন্দ্ শরমে নোয়ায়ে শির বে-তাজ!
বান্দা যাহারা বন্দেগী ছাড়া কি দিবে তাহারা, শাহান্শাহ্!
নাই সে ভারত মানুষের দেশ! এ শুধু পশুর কতল্গাহ্!
দম্ভে তোমার দম্ভ্ রাখিয়া নাই অধিকার মিলাতে হাত,
রূপার বদলে দু'পায়ে প্রভুর হাত বাঁধা রেখে খায় এ জাত!

(আমানুল্লাহ্/ জিঞ্জীর)

কবির মনে হয়েছে এ পরাধীন জাতির দুঃখ, দৈন্য, দুর্দশা ও কাপুরুষতা দেখে হয়তবা কাবুল নৃপতি লজ্জা ও বেদনায় মুখ ঢেকেছেন,

কাবুল-লক্ষ্মী দেহে মনে এই পরাধীনদেরে দেখিয়া কি
রহিল লজ্জা-বেদনায় হায়, বোর্কায় তাঁর মুখ ঢাকি'?

(আমানুল্লাহ্/জিঞ্জীর)

কবির উদ্দেশ্য ছিল আমানুল্লাহ্র নেতৃত্ব, সংগ্রাম ও আদর্শ চেতনা তাঁর স্বদেশের নিস্তেজ মানুষের মনে সঞ্চারিত করা— যাতে তারাও স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়।

'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থের 'জাগরণ' কবিতায় কবি ঘুমন্ত জাতির ঘুম ভাঙাবার প্রয়াস পেয়েছেন। এ জাতিকে কে যেন ঘুমের আফিম খাইয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে রেখেছে। নেশাগ্রস্ত জাতি জানে না তার ভবিষ্যৎ কোন্ অজানার পথে ধাবমান। কোন্ সর্বনাশা শক্তি তার চরম সর্বনাশ করছে, তাকে ভুলিয়ে দিচ্ছে তার নিজ পরিচয়কে? জাতির সম্পদ লুটে নিয়ে যাচ্ছে কোন্ লুটেরা? কবি মত ব্যক্ত করেছেন এ দেশবাসী জেগে উঠলে আবার তারা নিজেদের প্রকৃত অবস্থান ফিরে পেতে পারে। এসব সভ্যবেশী লুটেরাদের, অত্যাচারী দানবদের অর্থাৎ ইংরেজ শাসকদের আঘাত হানার ক্ষেত্রে দেশবাসীর ভয়ের কিছু নেই, সংকোচেরও কিছু নেই। কবি জাতিকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জাগরণের আহবান জানিয়েছেন এ কবিতায়—

Dhaka University Institutional Repository

তারাই দানব অত্যাচারী— যারা মানুষ মারে,

সভ্যবেশী ভণ্ড পশু মার্‌তে ডরাস্ কারে?

(জাগরণ/সন্ধ্যা)

কারণ এতদিনের অত্যাচারের হিসেব বুঝে নেবার সময় এসে গেছে এবং এ কাজ করতে হবে নব জীবনের নেতৃত্বকেই।

'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থের 'তরুণের গান' কবিতায় কবি তারুণ্যকে 'ঝড়ের বন্ধু' বলে অভিহিত করেছেন। 'এ কবিতায় পুনরায় ইসলামের ইতিহাস থেকে ফোরাত কূলে কারবালা প্রান্তরে এজিদ সেনার অবরোধ উপেক্ষা ক'রে হোসেন শিবিরে আব্বাসের পানি সংগ্রহের রূপকে পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণের বিরুদ্ধে স্বদেশের তরুণ শক্তির সংগ্রামের চিত্র পরিবেশিত হয়েছে',[১৩]

নব জীবনের ফোরাত-কূলে গো কাঁদে কারবালা তৃষ্ণাতুর,

ঊর্ধ্বে শোষণ-সূর্য, নিম্নে তপ্ত বালুকা ব্যথা-মরুর।

ঘিরিয়া য়ুরোপ-এজিদের সেনা এপার, ওপার, নিকট, দূর,

এরি মাঝে মোরা আব্বাস সম পানি আনি প্রাণ পণ করি'॥

(তরুণের গান/সন্ধ্যা)

কবি নজরুলের মনে একটা বিশ্বাস ছিল যে দেশ অচিরেই স্বাধীনতা লাভ করবে। কিন্তু তিনি সেদিনের সুখের অংশীদার হবেন না বলে তাঁর আশ্চর্য প্রতীতি ছিল। কেবল 'দূর তারা-লোকে' থেকে কবি দেশের স্বাধীন পতাকা ওড়ার দৃশ্য অবলোকন করবেন এবং সুখী হবেন। দেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে এক রকম নিশ্চিত কবির উচ্চারণ—

ভবিষ্যতের স্বাধীন পতাকা উড়িবে যে-দিন জয়-রথে

আমরা হাসিব দূর তারা-লোকে, ওগো তোমাদের সুখ স্মরি'॥

(তরুণের গান/সন্ধ্যা)

কবি নজরুল ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে স্বাধীনতা লাভ করতে হলে দেশের যুব সম্প্রদায়কে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিতে হবে। সেজন্য যুব সম্প্রদায়ের মনকে সামরিক কায়দায় প্রস্তুত করে তুলতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন সামরিক সঙ্গীতের। সে প্রয়োজন মেটাতে কবি লিখেছেন—

ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত

আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,

আমরা টুটাব তিমির রাত,

বাধার বিন্ধ্যাচল।

(চল্ চল্ চল্/সন্ধ্যা)

Dhaka University Institutional Repository

অথবা,

টলমল টলমল পদভরে,
বীরদল চলে সমরে।।

খরধার তরবার কটিতে দোলে
রণন ঝণণ রণ- ডঙ্কা বোলে।
ঘন তূর্য-রোলে
শোক-মৃত্যু ভোলে
দেয় আশিস্ সূর্য সহস্র করে।।

(সমর-সঙ্গীত/প্রলয়-শিখা)

শহীদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহচেতনা জাগবে মুক্তিপিপাসা অনুভূত হবে। যতীন দাস দেশের জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাই কবি শত্রুজয়ী বিপ্লবী শক্তিতে উদ্বোধন করতে তৎপর হয়ে উঠেছেন।

মহিষ-অসুর- মর্দিনী মা গো,
জাগ্ এইবার খড়্গ ধর।
দিয়াছি "যতীনে" অঞ্জলি—
নব-ভারতের আঁখি-ইন্দীবর।

(যতীন দাস/প্রলয়-শিখা)

'রক্ত-তিলক' কবিতায় শত্রুসংহার করে পরাধীনতার রাত্রি শেষে নতুন মুক্তির প্রভাত আনার জন্যে গণজাগরণের প্রয়োজনীয়তা ও সাধারণ মানুষের অংশ গ্রহণের কথা উচ্চারণ করেছেন কবি—

শত্রু-রক্তে রক্ত-তিলক পরিবে কা'রা?
ভিড় লাগিয়াছে— ছুটে দিকে দিকে সর্বহারা।

(রক্ত-তিলক/প্রলয়-শিখা)

কবি নজরুল বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভিনদেশী সরকারের কূটকৌশলের কাছে ধরা দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবেনা বা তাদের সঙ্গে কোন সমঝোতায় আসাও সম্ভব নয়। কারণ তাদের সব ভালর পশ্চাতেও স্বার্থপরতা বিদ্যমান। ইংরেজের সঙ্গে আপোসের দ্বারা হিন্দু-মুসলমান মিলন অথবা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। নজরুল নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন। তাই কবি দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলেছেন—

আঁটসাঁট ক'রে গাঁট-ছড়া বাঁধা
হ'ল টিকি আর দাড়িতে,

Dhaka University Institutional Repository

"বজ্র আঁটুনি ফস্‌কা গেরো"? তা

হয় হোক তাড়াতাড়িতে।

(প্যাক্ট/চন্দ্রবিন্দু)

অন্যত্র বলেছেন—

বদনা-গাড়ুতে পুন ঠোকাঠুকি,

রোল উঠিল "হা হন্ত!"

ঊর্ধ্বে থাকিয়া সিঙ্গী-মাতুল

হাসে ছিরকুটি' দন্ত!

(প্যাক্ট/চন্দ্রবিন্দু)

আচরণের দিক বিবেচনা করে নজরুল ইংরেজকে সিংহ প্রতীকে উপস্থাপন করেছেন। একই সঙ্গে ভারতবর্ষকে হস্তী, ফ্রান্সকে বাঘ, রুশিয়াকে ভল্লুক, ইটালিকে হাঙ্গর, অস্ট্রীয়াকে নেকড়ে, গ্রীসকে শিবা, আমেরিকাকে হায়েনা এবং জার্মানীকে ঈগল প্রতীকে উপস্থাপন করেছেন।

বসেছে শান্তি-বৈঠকে বাঘ,

সিংহ, হাঙর, নেকড়ে!

বৈষ্ণব গরু, ছাগ, মেষ এসে

হরিবোল বলে দেখ্ রে।।

(লীগ-অব-নেশন্/চন্দ্রবিন্দু)

বিদেশী সরকার ভারতবর্ষে সীমিত স্বাধীনতা প্রদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে নজরুল তার প্রতি ব্যঙ্গ করে রচনা করেন 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস্' কবিতা। এ কবিতায় কবি এদেশের অসার রাজনীতি এবং ইংরেজ প্রভুদের কটাক্ষ করে বলেন—

বগল বাজা দুলিয়ে মাজা,

বসে কেন অম্‌নি রে!

ছেঁড়া ঢোলে লাগাও চাঁটি,

মা হবেন আজ ডোম্‌নী রে।।

রাজা শুধু রাজাই র'বেন

পগার-পারে নির্বাসন,

রাজ্য নেবে দু'ভাই মিলে

দুর্যোধন আর দুঃশাসন!

(ডোমিনিয়ন স্টেটাস্/চন্দ্রবিন্দু)

Dhaka University Institutional Repository

বলা বাহুল্য, উপরে উল্লিখিত স্তবকে দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে নজরুলের আপোষহীন মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

'পূজা-অভিনয়' কবিতায় পূজার মূল অনুপ্রেরণার প্রতি ইঙ্গিত করে কবি বলেছেন পূজারী দেবতার যোগ্য না হলে সে পূজা সার্থক হবে না। কবি বুঝাতে চেয়েছেন যে, দুর্গা আরাধনা তার প্রকৃত তাৎপর্য আজ হারিয়ে ফেলেছে। দুর্গার আরেক নাম 'সিংহবাহিনী', অতএব সিংহবাহিনীকে পূজা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে অসুরকে পরাজিত করার প্রতিজ্ঞা। ভারতবর্ষ শ্বেত অসুরদের দখলে। কাজেই সেই অসুর বিতাড়নের পদক্ষেপ না নিলে সব পূজাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

বিগ্রহ-চালে হাসে বুড়োশিব, বলে, "দেখ দেখ দশভুজা,
নেংটি পরিয়া নেংটে ইঁদুর ভক্তরা এল দিতে পূজা!
গণেশ-ভক্ত ইঁদুরে বুদ্ধি হস্তীকর্ণ লম্বোদর,
কার্তিকে মোর সাজায়েছে দেখ, যেন উহাদের মেয়ের বর!

(পূজা-অভিনয়/নির্ঝর)

'শিখা' কবিতায় কবি অতীতের দাসত্ব, চাকুরির মোহ, যৌবনহীনতা আর সস্তা রাজনীতিকেই ভারতের পরাধীনতা ও দুর্দশার জন্যে দায়ী করেছেন। তাই অন্যের ওপর ভরসা না করে নিজেই দায়িত্ব বুঝে নিয়ে সামনে অগ্রসর হবার জন্যে নজরুল তরুণদেরকে বিপ্লবী আহবান জানিয়েছেন—

অতীতের দাসত্ব ভোলো! বৃদ্ধ সাবধানী
হইতে পারে না কভু তোমাদের নেতা!
তোমাদেরই মাঝে আছে বীর সব্যসাচী
আমি শুনিয়াছি বন্ধু সেই ঐশীবাণী
ঊর্ধ্ব হতে রুদ্র মোর নিত্য কহে হাঁকি,
শোনাতে এ কথা, এই তাঁহার আদেশ।

(শিখা/নতুন চাঁদ)

'শেষ সওগাত' কাব্যের অন্তর্গত 'জাগো সৈনিক-আত্মা' কবিতায় কবি নজরুল পরাধীন ভারতের দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে নব জীবন ও মুক্তির জন্যে সৈনিক-আত্মা ও দুর্মদ যৌবনের জাগরণ কামনা করেছেন। কবির স্বভাব সুলভ আহবান—

জাগো অনিদ্র অভয় মুক্ত মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ,
তোমাদের পদ-ধ্বনি শুনি' হোক অভিনব উত্থান
পরাধীন শৃঙ্খল-কবলিত পতিত এ ভারতের!
এসো যৌবন রণ-রস-ঘন হাতে লয়ে শমশের!

(জাগো সৈনিক-আত্মা/শেষ সওগাত)

Dhaka University Institutional Repository

স্বদেশের পরাধীনতার বিষময়জ্বালা কবিকে উন্মাদ করেছিল। নির্যাতিত মানবতার জাগরণ-উন্মাদনায় কবির অন্তরের অশান্ত বহ্নি-জ্বালার দুর্বার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর উপন্যাসগুলোতে।

নজরুলের রচিত 'বাঁধনহারা', 'মৃত্যুক্ষুধা' এবং 'কুহেলিকা'- এই উপন্যাস তিনটিতে নায়করা তাদের স্বদেশের শৃঙ্খলমুক্তির দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে কঠোর সংগ্রাম সংঘটনে তৎপর। যে চেতনার বশবর্তী হয়ে নজরুল স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে কারাবরণ করতেও দ্বিধা করেননি, পশ্চাদপদ হননি, তাঁর উপন্যাসের নায়করাও চরিত্রগতভাবে একই চেতনাক্রান্ত। 'মেঘনাদবধ কাব্য' পাঠ করলে যেমন পাঠক সহজেই রাবণরূপী মধুসূদনকে চিনতে পারেন, 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শ্রীকান্তের ছদ্মবেশে শরৎচন্দ্রকে চিনতে যেমন পাঠককে বেগ পেতে হয় না, একইভাবে নজরুলের উপন্যাসগুলো পাঠ করে আনসার, জাহাঙ্গীর ও নুরুর ছদ্মবেশে নজরুলকে চিনে নিতে কারো সমস্যা হয় না।

'বাঁধনহারা' উপন্যাসে বর্ণিত নূরুল হুদাই স্বয়ং নজরুল। এ উপন্যাসে করাচীর সেনানিবাস থেকে লেখা পত্রগুলোতে তাঁর দুর্বার যৌবন এবং প্রবল ঘূর্ণির ন্যায় অত্যুগ্র 'আমি'র সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। নূরুল হুদার প্রকৃতি সম্বন্ধে যখন বলা হয়—

"তার জীবনে সত্য রয়েছে, তবে রুদ্র মূর্তিতে! এর পরেই যখন কল্যাণ জাগবে জীবনে তখন দেখবি সব সুন্দর হয়ে গিয়েছে।"

তখন বুঝতে অসুবিধা হয়না যে উক্তিটি প্রকারান্তরে নজরুল-জীবনের চরম সত্য পরিচয়কেই বহন করে। নজরুল সুন্দরের সাধনা করেছেন তাঁর জীবনে ও রচনাকর্মে। মানুষের জীবনে সুন্দরকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, দেশকে মুক্ত ক'রে সুন্দর মানবতারই জয় ঘোষণা করতে চেয়েছেন। আর এ সুন্দরের সাধনা করেছেন তিনি বিপ্লবের বহ্নিশিখা জ্বালিয়ে।

নজরুল কথায় এবং কাজে সব সময় জাতীয় পুনরুজ্জীবনের মন্ত্রে স্বজাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি স্বদেশের এবং বিশ্বের অপরাপর দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিপ্লবের মন্ত্রে সর্বদা উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে আনসারের কণ্ঠে সে ভাবনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে—

"আমি জানি, তোমাদের জয় হবে।তোমাদের কণ্ঠে স্বাধীন মানবাত্মার শঙ্খধ্বনি শুনতে পাচ্ছি!"

অন্যত্র,

"বন্ধুগণ! আমার বিদায়কালে তোমাদের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ, তোমরা তোমাদের অধিকারের দাবী কিছুতেই ছেড়ো না! তোমাদেরও হয়ত আমার মত করেই শিকল পরে জেলে যেতে হবে, গুলী খেয়ে মরতে হবে, তোমারই দেশের লোক তোমার পথ আগ্‌লে দাঁড়াবে, সকল রকমে কষ্ট দেবে, তবু তোমরা তোমাদের পথ ছেড়ো না, এগিয়ে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত হয়ো না। আগের দল মরবে বা পথ ছাড়বে, পিছনের দল তাদের শূন্যস্থানে গিয়ে দাঁড়াবে। তোমাদের মৃতদেহের ওপর দিয়েই আসবে তোমাদের মুক্তি।"

প্রকৃতপক্ষে আনসারের মুখ দিয়ে নজরুল তাঁর নিজের মনোভাবই ব্যক্ত করেছেন। দেশের মুক্তি আন্দোলনের পথে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে তাদের সাহস যুগিয়ে প্রেরণা দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ শতকের প্রারম্ভে বঙ্গভঙ্গবিরোধী মনোভাবাপন্ন হিন্দু তরুণদের নিয়ে যে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন গড়ে ওঠে তার কর্মীরা রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রেখে দেশোদ্ধারের অভিপ্রায়ে 'একাকী পথ চলতে' শুরু করে। 'কুহেলিকা' (১৯৩১) উপন্যাসে এ সত্য উপস্থাপিত। ব্রিটিশ ভারতে সন্ত্রাস আন্দোলনের দিকও কাহিনীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এখানে তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে একযোগে অংশ গ্রহণের তাগিদ দিয়েছেন। তাই উপন্যাসে এর নায়ক দীক্ষিত বিপ্লবী সংগঠনের কর্মী জাহাঙ্গীরের উপস্থিতি লক্ষ্যগোচর হয়। পাক-ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে উভয় ধর্মের মানুষকেই সম্পৃক্ত করার মানসিকতা থেকেই জাহাঙ্গীর চরিত্রের সৃষ্টি। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের একযোগে সংগ্রামে অংশগ্রহণের বাস্তব প্রয়োজনীয়তার কথাই নজরুল জাহাঙ্গীর চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। কারণ 'ইংরেজের ভারত-শাসনের বড় যন্ত্র' হিসেবে নজরুল যে জিনিসটাকে চিহ্নিত করেছেন তা প্রমত্তের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। তা হচ্ছে—

"আমাদের পরস্পরের প্রতি এই অবিশ্বাস, পরস্পরের ধর্মে আন্তরিক ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা।" তাই অসাম্প্রদায়িক কবি নজরুল এদেশ থেকে ইংরেজ সরকারকে বিতাড়নের জন্য হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত প্রয়াসের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। প্রমত্তকে দিয়ে বলিয়েছেন সে কথা—

"যে-দিন ভারত একজাতি হবে সেইদিন ইংরেজকেও বোঁচকা-পুঁটলি বাঁধতে হ'বে। একথা শুধু যে ইংরেজ জানে তা নয়, রামা শ্যামাও জানে।"

নজরুলের গল্পগ্রন্থেও পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে। 'রিক্তের বেদন' গল্পগ্রন্থের 'দুরন্ত পথিক' শীর্ষক কথিকায় দুরন্ত পথিক দুর্বার তারুণ্যের প্রতীক। সে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত মুক্তি সৈনিক। নির্যাতিত মানবতার মুক্তিই তার কাম্য। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে সে স্বাধীনতা সূর্যকে ছিনিয়ে আনবে। দুরন্ত পথিকের দুর্গম পথ পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির পথ। এ পথে চলতে গিয়ে তাকে সহস্র বাধার সম্মুখীন হতে হবে। মৃত্যু তার ভয়াল থাবা বিস্তার করে আছে সর্বত্র। এ সত্য জেনেও তরুণ পথিক তার পথ থেকে বিচ্যুত হয় না। আগামী দিনের শত সহস্র নবীন পথিক তারই পথ ধরে অগ্রসরমান। প্রকৃতপক্ষে দুরন্ত পথিককে কল্পনার মধ্য দিয়ে নজরুল তাঁর বিপ্লবী চরিত্রেরই প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

কাজী নজরুল ইসলাম 'স্বকাল-বিদ্ধ' প্রাবন্ধিক।[১৪] সময়ের দাবি মেটাতে 'নবযুগ' পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ রচনার যাত্রারম্ভ হয়। দ্রোহী চেতনাক্রান্ত এবং শাসিত এ কবির হাতে সেই বোধিসত্তা রচিত হয় যা তেত্রিশ কোটি ভারতবাসী মনেপ্রাণে চেয়েছিল। 'নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলো 'যুগবাণী' গ্রন্থ নামে প্রকাশ পায় ১৯২২ সালের অক্টোবরে। বইটি প্রকাশের প্রায় সাথে সাথেই নিষিদ্ধ হয়। ১৯২২ সালে বাংলা সরকার ফৌজদারী বিধির ৯৯-এ ধারানুসারে বইটি বাজেয়াপ্ত করে। সেন্ট্রাল প্রভিন্স ও বর্মা সরকারও যুগপৎ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে 'যুগবাণী' নিষিদ্ধ করে। বাংলা সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও নম্বর যথাক্রমে ২৩ নভেম্বর, ১৯২২ এবং ১৬৬৬১ পি।

'যুগবাণী' নিষিদ্ধ হওয়ার ইঙ্গিত আগেই দেখা দিয়েছিল। মুজফ্‌ফর আহমদ এবং নজরুলের যুগ্ম সম্পাদনায় নবযুগের জ্বালাময়ী লেখাগুলো ব্রিটিশ-বাংলার ক্লীব কর্মকর্তাদের মোটেই পছন্দ হয়নি। তাই তারা একবার এ পত্রিকার জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করে। এর মূল কারণ নজরুলের সম্পাদকীয় রচনা। সেই

Dhaka University Institutional Repository

রচনাগুলোই 'যুগবাণী'তে স্থান পায়। প্রতিবাদ, ব্যঙ্গ, শ্লেষ ধারণ করেছে ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থ 'যুগবাণী'। মর্মে ঘৃণা উপ্ত করে তোলা হয়েছে ব্রিটিশ শাসক-শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে। তাদের নিষ্ঠুর আচরণ, হত্যাযজ্ঞ বিরোধী জনমত গঠন করেছে নজরুলের প্রবন্ধাবলী। ইংরেজ সরকার কেন 'যুগবাণী' নিষিদ্ধ করেছে সে সম্পর্কে শিশির কর তাঁর 'নিষিদ্ধ নজরুল' গ্রন্থে পুলিশি গোপন রিপোর্ট উদ্ধার করেছেন।

"I have examined the book 'Yugabani'. It breathes bitter racial hatred directed mainly against the British Preaches revolt against the existing administration in the country and abuses in the very strong language the Slave-minded' Indians who upholds the administration. The three articles on 'Memorial to Dyer' who was responsible for the Muslims massacre? and Shooting the blackmen' are specially objectionable. I don't think it would be advisable to remove the ban on this book in the present crisis. On the whole it is a dangerous book, forceful and vindictive."[১৫] (sd illegible, date:

16.1.41, File no. 58-31/40 Home Pol]

সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে 'যুগবাণী' কতটা আতঙ্কজনক ছিল, তা প্রমাণ করে এই পুলিশি গোপন রিপোর্ট। বইটি নিষিদ্ধ করার ২১ বছর পরও একই রকম ধারণা পোষণ প্রমাণ করে স্বাধীনতা সম্পর্কিত নজরুলের মনোভাবের প্রকৃতি।

বইটির সূচীর দিকে তাকালেই এর নিষিদ্ধ হবার অন্তর্নিহিত কারণের কিয়দংশ উপলব্ধ হয়। মোট ২১টি প্রবন্ধের সংকলন এটি। প্রবন্ধের শিরোনামগুলো হচ্ছে— 'নবযুগ', "গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ'!," 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ', 'ধর্মঘট', 'লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য', 'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?', 'বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান', 'ছুঁৎমার্গ', 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন', 'মুখবন্ধ', 'রোজ-কেয়ামত বা প্রলয়-দিন', 'বাঙালির ব্যবসাদারী', 'আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন?' 'কালা আদমীকে গুলি মারা' 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি', 'লাট-প্রেমিক আলি ইমাম', 'ভাব ও কাজ', 'সত্য-শিক্ষা', 'জাতীয় শিক্ষা', 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়', 'জাগরণী'।

'যুগবাণী'র প্রবন্ধগুলো নবযুগ না হোক, নব-চেতনার আলোক ছড়িয়ে দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, সূচী পড়লে তা উপলব্ধ না হবার তেমন কারণ নেই। প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থের দুএকটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যায়। 'নবযুগ'কে কাজী নজরুল নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করেছেনঃ

'আজ মহাবিশ্বে মহাজাগরণ, আজ মহামাতার মহাআনন্দের দিন, আজ মহামানবতার মহাযুগের মহাউদ্বোধন! আজ নারায়ণ আর ক্ষীরোদসাগরে নিদ্রিত নন। নরের মাঝে আজ তাঁহার অপূর্ব মুক্তি-কাঙাল বেশ। ঐ শোনো, শৃঙ্খলিত নিপীড়িত বন্দীদের শৃঙ্খলের ঝনৎকার। তাহারা শৃঙ্খল-মুক্ত হইবে, তাহারা কারাগৃহ ভাঙিবে। ঐ শোনো মুক্তি-পাগল মৃত্যুঞ্জয় ঈশানের মুক্তি-বিষাণ! ঐ শোনো মহামাতা জগদ্ধাত্রীর শুভ শঙ্খ। ঐ শোনো ইস্রাফিলের শিঙ্গায় নব সৃষ্টির উল্লাস-ঘন রোল! ঐ যে ভীম রণ-কোলাহল, তাহাতেই মুক্তিকামী দৃপ্ত তরুণের শিকল টুটার শব্দ ঝনঝন করিয়া বাজিতেছে।'

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রবন্ধে যে বিষয়টি স্পষ্ট তা হচ্ছে নজরুলের সমাজতান্ত্রিক বোধ এবং বিপ্লবী চিন্তার প্রকাশ। স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে সশস্ত্র সংগ্রাম-যুদ্ধ প্রয়োজন। তাই তিনি লেখেন—

'আবার দূরে সেই সর্বনাশা বাঁশির সুর বাজিয়া উঠিল। রুশিয়া বলিল, "মারো অত্যাচারীকে। ওড়াও স্বাধীনতা-বিরোধীর শির! ভাঙো দাসত্বের নিগড়! এ বিশ্বে সবাই স্বাধীন। মুক্ত আকাশের এই মুক্ত মাঠে দাঁড়াইয়া কে কাহার অধীনতা স্বীকার করিবে? এই 'খোদার উপর খোদকারী' শক্তিকে দলিত কর। এই স্বার্থের শাসনকে শাসন কর।" "আল্লাহু আকবর" বলিয়া তুর্কি সাড়া দিল।... আইরিশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "যুদ্ধ শেষ হয় নাই। এখনো বিশ্বে দানবশক্তির বজ্রমুষ্টি আমাদের টুটি টিপিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। এ অসুর শক্তি ধ্বংস না হইলে দেবতা বাঁচিবে না। যজ্ঞ জ্বলুক। এ হোম-শিখায় যদি কেহ যোগ না দেয়, আমরা আমাদের প্রাণ আহুতি দিব।" এমন সময় ভারত জাগিল।'

'যুগবাণী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলোর রচনাকাল ১৯২০ সাল। সে সময় ভারত জুড়ে চলছিল খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন। মানবতাবাদী নজরুল এই দ্বিবিধ আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা সম্ভব বলে বিশ্বাস করতেন। রাশিয়ার জাগরণের কথা (১৯১৭ সালে রাশিয়া জারমুক্ত হয়, তখনও সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়নি), তুরস্কের সাড়া দেবার কথা (কামাল আতাতুর্কের ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী সংগ্রাম) এবং আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতাকামী দেশবাসীর প্রত্যাশার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ বিশ্বের অর্ধেক অঞ্চলে বিপ্লব দীক্ষা এবং পরাধীনতার, শোষণের, অন্যায়-অবিচার আর মানবতাবিরোধিতার বিরুদ্ধে বিজয় অর্জিত হচ্ছে-কাজী নজরুল ইসলাম সেই আলোক দ্যুতি ভারতের অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং নির্বীর্য জাতিসত্তার মর্মমূলে জাগিয়ে তোলার মন্ত্রণা হিসেবে দেখেছিলেন খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনকে। কিন্তু এই আন্দোলনকে হঠাৎ স্তব্ধ করে দেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৯২২ সালে। এই রাজনৈতিক ব্যর্থতার পুরো দায় মহাত্মা গান্ধীর। এর পর নজরুল সশস্ত্র সংগ্রামের পথে দেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব— এই মত পোষণ করেন। তাঁর সাম্যবাদী মানসপ্রবণতা সেই সাক্ষ্যই দেয়।

'নবযুগ' প্রবন্ধটি 'নবযুগ' পত্রিকার সূচনা সংখ্যার জন্যে লিখিত। এ পত্রিকার আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাই যেখানে সম্পাদকের কাজ ছিল, সেখানে নজরুল পত্রিকার এবং দেশবাসীর প্রত্যাশাকে একত্রিত করে পরাধীন ভারতের স্বাধীনতার কথাই বলেছেন। সর্ব ধর্মের দেবতারা আজ জেগেছেন, ইস্রাফিলের শিঙ্গার ধ্বনিতে আজ নব সৃষ্টির রোল বিবেচনা করে তিনি "এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান! এস বৌদ্ধ! এস ক্রিশ্চিয়ান!" বলে ভারতের সব মানুষকে আহবান জানিয়েছেন। নজরুল চেতনা প্রবাহের মৌলিক গতিবেগ এটাই।

পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাযজ্ঞের নায়ক জেনারেল ডায়ারের প্রতি ব্যঙ্গ উপ্ত হয়েছে 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ' প্রবন্ধেঃ

'এ-ডায়ারকে ভুলিব না, আমাদের মুমূর্ষু জাতিকে চিরসজাগ রাখিতে যুগে যুগে এমনই জল্লাদ-কসাই-এর আবির্ভাব মস্ত বড় মঙ্গলের কথা।'

Dhaka University Institutional Repository

অন্যত্র,

'এই ডায়ারের মতো দুর্দান্ত কসাই সেনানী যদি সেদিন আমাদিগকে এমন কুকুরের মতো করিয়া না মারিত, তাহা হইলে কি আজিকার মতো আমাদের এই হিম-নিরেট প্রাণ অভিমান-ক্ষোভে গুমরিয়া উঠিতে পারিত— না, আহত আত্মসম্মান আমাদের এমন দলিত সর্পের মতো গর্জিয়া উঠিতে পারিত? কখনই না।'

কাজী নজরুল ইসলাম রাজনীতিক না হয়েও যেহেতু রাজনৈতিক অভিঘাতে আলোড়িত-বিলোড়িত হতেন এবং নিজের চেতনালোক দ্বারা পরিচালিত হতেন; সে জন্যে তাঁর আবেগাক্রান্ত দ্রোহের ফসল হিসেবে পরাধীন ভারতের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করার হাতিয়ার করে তুলেছিলেন নিজের সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকর্মকে। তাঁর রাজনৈতিক চেতনার উৎসভূমি মানবপ্রেম, প্রকাশ বিদ্রোহ; এবং পরাধীন ভারতের স্বাধীনতাই সে-বিদ্রোহের অন্বিষ্ট। ব্রিটিশ শৃঙ্খল শাসনকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্যে তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন।

'এস ভাই হিন্দু! এস ভাই মুসলমান! তোমার আমার উপর অনেক দুঃখ-ক্লেশ, অনেক ব্যথা-বেদনার ঝড় বহিয়া গিয়াছে; আমাদের এ বাঞ্ছিত মিলন বড় দুঃখের, বড় কষ্টের ভাই! খোদা যখন আমাদের জাগাইয়াছেন, তখন আর যেন আমরা না ঘুমাই।'

'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?' প্রবন্ধে নজরুল একদল মুহাজিরিনকে ব্রিটিশ সরকারের সামরিক পুলিশ কর্তৃক হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এসব নিরস্ত্র মানুষ ব্রিটিশ সরকারের দুঃশাসনের হাত থেকে বাঁচার জন্য স্বদেশ ছেড়ে, আত্মীয় পরিজনের মায়া-মমতা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাচ্ছিল স্বাধীন জীবনের প্রত্যাশায়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ কর্তৃক তারা নিহত হয়। আর এ হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয় ভারতীয় সৈন্যদের দ্বারাই। মানবতার চরম অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে 'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?' প্রবন্ধে নজরুল ভারতের জনগণের পক্ষে উদাত্ত স্বরে বলেছেন—

'কিন্তু আর আমরা দাঁড়াইয়া মার খাইব না, আঘাত খাইয়া খাইয়া, অপমানে বেদনায় আমাদের রক্ত এইবার গরম হইয়া উঠিয়াছে। কেন, তোমাদের আত্মসম্মানজ্ঞান আছে, আর আমাদের নাই? আমরা কি মানুষ নই?'

অন্যত্র বলেছেন—

'না জানি আরো কত বাছাদের, আমাদের কতো মা-বোনদের খুলি উড়াইয়াছ, তোমরাই জান। আমাদের যে ভাই আজ তোমাদের হাতে শহীদ হইল, সে এমন এক মুক্ত স্বাধীন দেশে গিয়া পৌঁছিয়াছে যেখানে তোমাদের গুলি পৌঁছিতে পারে না। সে যে মুক্তির সন্ধানেই বাহির হইয়াছিল! মনে রাখিও, সে খোদার আরশের পায়া ধরিয়া ইহার দাদ (বিচার) মাগিতেছে! দাও, উত্তর দাও! বল তোমার কি বলিবার আছে!'

'রাজবন্দীর জবানবন্দী' লিখিত হয় কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে ১৯২৩ সালের ৭ই জানুয়ারী, তখন বিদ্রোহী কবি ইংরেজ সরকারের কারাগারে বন্দী। 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামের একটি কবিতায় নজরুল ইংরেজ সরকার এবং দেশীয় রাজনীতিকদের ব্যঙ্গ-শ্লেষে তাদের প্রকৃত রূপ উদ্‌ঘাটন করেন। এ কবিতা প্রকাশের পর রাজরোষে নজরুল জেলে যান। জেলে অবস্থানকালেই তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও সরকার

Dhaka University Institutional Repository

উৎখাতের ইন্ধনদাতার অভিযোগ এনে মামলা করা হয় এবং বিচারপতি সুইনহো'র আদালতে বিচার শুরু হয়। এ সময়ই নজরুল 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' রচনা করেন। এতে নজরুল ইসলামের মানস-প্যাটার্ন এবং তাঁর অন্তরগূঢ় অভীপ্সা স্ফূরিত হয়ে উঠেছে। এটি স্বতঃস্ফূর্ত তরঙ্গের মত নজরুলের চেতনার ঊর্মিমালায় উন্মত্তরূপ প্রকাশ করেছে।

ইংরেজের গাত্রদাহ সৃষ্টিকারী বিপ্লবী বাণীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া যায়—

'আমি মরব, রাজাও মরবে, কেননা আমার মতন অনেক রাজবিদ্রোহী মরেছে, আবার এমনি অভিযোগ আনয়নকারী বহু রাজাও মরেছে, কিন্তু কোন কালে কোন কারণেই সত্যের প্রকাশ নিরুদ্ধ হয় নি— তার বাণী মরেনি। সে আজও তেমনি ক'রে নিজেকে প্রকাশ করছে এবং চিরকাল ধরে করবে। আমার এই শাসন-নিরুদ্ধ বাণী আবার অন্যের কণ্ঠে ফুটে উঠবে।'

১৯২২ খ্রীস্টাব্দে নজরুলের সারথ্যে 'ধূমকেতু' নামক যে অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় তাতে প্রথম থেকেই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অবিরাম আঘাত হানা হয়। নজরুলের লেখায় যদিও বিচার বিবেচনা করে রাজনৈতিক বিষয় আলোচিত হয়নি তথাপি এতে যে রাজনৈতিক মতামত প্রচারিত হয়েছে তা লক্ষ্য করা যায়। 'ধূমকেতু'তে তিনি ঘোষণা করেন— 'মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা' যা 'দুর্দিনের যাত্রী' প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ এবং বিপ্লবী ঘোষণা—

'বল, কারুর অধীনতা মানি না, স্বদেশীরও না, বিদেশীরও না।'

স্বদেশবাসীকে সচেতন করে তোলার জন্য নজরুল আঘাতের দেবতাকে আহবান করে বলেছেন—

'অবমানিত হয়ে যাদের চোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত না হ'য়ে অশ্রুজল নির্গত হয়, তাদেরে আঘাত কর, আঘাত কর হে আঘাতের দেবতা! মারো তাদের বুকে মুখে পিঠে— মারো তাদেরে। জাগাও তাদের আত্মসম্মান! পৌরুষ তাদের হুঙ্কার দিয়ে পড়ুক অত্যাচারের বুকে।'

'ধূমকেতু'র সারথি প্রকাশ্যে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে ভারতবাসীর বুক থেকে শতাব্দীর দ্বিধার পাহাড় সরিয়ে দেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন,

'সর্বপ্রথম, "ধূমকেতু" ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।

স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, কেননা, ও-কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম ক'রে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তাতে কোনো বিদেশীর মোড়লী করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এ-দেশে মোড়লী ক'রে দেশকে শ্মশান-ভূমিতে পরিণত করছেন, তাঁদেরে পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা-পুঁটলি বেঁধে সাগর-পারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। তাঁদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয় নি এখনো। আমাদেরো এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে।'

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল সাবধানী উপদেশ উপেক্ষা করে আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে 'পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে' সর্ব প্রথম বিদ্রোহ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন 'সকল-কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে।'

পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য নজরুলের বিপ্লবী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর অভিভাষণেও । উপনিবেশকে আঁকড়ে রাখার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সুকৌশলে 'ডিভাইড এ্যান্ড রুল' পলিসির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করে, যা এদেশের মানুষের সংঘবদ্ধ হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ। ফলে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হচ্ছিল না। নজরুল তাই হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে এক ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হবার আহবান জানান। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে 'মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা' শীর্ষক অভিভাষণে বলেন—

'ভারত যে আজ পরাধীন এবং আজো যে স্বাধীনতার পথে তার যাত্রা শুরু হয়নি— শুধু আয়োজনেরই ঘটা হচ্ছে এবং ঘটও ভাঙছে— তার একমাত্র কারণ আমাদের হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি হিংসা ও অশ্রদ্ধা। আমরা মুসলমানেরা আমাদেরই প্রতিবেশী হিন্দুর উন্নতি দেখে হিংসা করি, আর হিন্দুরা আমাদের অবনত দেখে আমাদের অশ্রদ্ধা করে। ইংরেজের শাসন সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে এই যে, তার শিক্ষা-দীক্ষার চমক দিয়ে সে আমাদের এমনিই চমকিত করে রেখেছে যে, আমাদের এই দুই জাতির কেউ কারুর শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতার মহিমার খবর রাখিনে।'

নজরুল মুসলমানদের সম্পর্কে হিন্দুদের ধারণাকে স্বচ্ছ করার জন্য মুসলমানদেরকেই পদক্ষেপ নেয়ার আহবান জানান। তিনি হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর পরস্পরের 'Next door neighbour' বলে উল্লেখ করেন। নজরুল মুসলমানদেরকে মাতৃভাষায় সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাস-সভ্যতার অনুবাদ ও অনুশীলনের ব্যবস্থা করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন— 'আমাদের Next door neighbour-এর মন থেকে আমাদের প্রতি এই অশ্রদ্ধা দূর হবে এই এক উপায়ে আর তবেই ভারতের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হবে।'

নজরুলের চিঠিপত্রেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর বিপ্লবী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। সম্পাদক এম্. সিরাজুল হককে লিখিত পত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়—

'ধূমকেতু'র সারথী-রূপে নয়— যুদ্ধের ময়দান হতেই তারুণ্যের নিশান-বর্দার আমি। তাই ছুটে এসেছি দেশবাসীর পাশে। আজাদি অনাগত— তারই আগমনী গাওয়া ও তা হাসিল করাই বিপ্লবীর প্রাণের লক্ষ্য। আপনারা লক্ষ্যপথ ধরে যাত্রা করুন। কোন বিঘ্নই সে পথে দাঁড়াতে সক্ষম হবে না। দেশ গোলামির জিঞ্জির হতে মুক্ত হোক! মুক্ত-প্রাণে মুক্ত-বাতাসে যেদিন মুক্তির গান গাইতে পারব, সেই দিন হবে আমার অভিযানের শেষ।'

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে নজরুলকে পাওয়া যায় একজন স্বদেশ প্রেমিক, বিপ্লবী চেতনার কবি হিসেবে এবং একজন সাম্যবাদের চেতনাসম্পন্ন কবি হিসেবে। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি যে বিষ-বাণী উচ্চারণ করেছেন— দুর্বলের মনোভাব ব্যক্ত করেননি তা আলোচনায় লক্ষণীয়। তাঁর রচনায় রয়েছে অমিত তেজ, যা জাতিকে করে তোলে দুর্জয়। নজরুল নিদ্রাভিভূত জাতিকে সচেতন করেছেন বিষাণ-বাণীতে, জাগিয়ে তুলেছেন রণভেরীর আওয়াজে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. V. Anstey, 'The Economic Development of India', Longman, (3rd edition), 1936, Page-5.

২. মজিদ মাহমুদ, 'নজরুল তৃতীয় বিশ্বের মুখপাত্র' নজরুল ইন্সটিটিউট, জুন ১৯৯৭, পৃ: ৩৩।

৩. ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত, 'নজরুল- চরিতমানস', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় দে'জ সংস্করণ জানুয়ারী- ১৯৯৭, পৃ: ১০৬।

৪. তদেব, পৃ: ১৪২।

৫. রফিকুল ইসলাম, 'কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও কবিতা', মল্লিক ব্রাদার্সঃ ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৩৮৯, পৃ: ৩৮৪।

৬. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, 'নজরুল ইসলাম কবিমানস ও কবিতা', রত্নাবলী, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৯৮, পৃ: ২৬৫-২৬৬।

৭. রফিকুল ইসলাম, 'কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও কবিতা', মল্লিক ব্রাদার্সঃ ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৩৮৯, পৃ: ৪২৪।

৮. তদেব, পৃ: ৪২৪।

৯. আবু হেনা আবদুল আউয়াল, 'নজরুলের নাম-কবিতার পটভূমি ও অন্যান্য তথ্য', 'সাহিত্য পত্রিকা', (নজরুল জন্মশতবার্ষিক সংখ্যা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ: ১৬৬।

১০. রফিকুল ইসলাম, 'কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও কবিতা', মল্লিক ব্রাদার্সঃ ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৩৮৯, পৃ: ৪৩০।

১১. তদেব, পৃ: ৪৪৫।

১২. তদেব, পৃ: ৪৪৯।

১৩. তদেব, পৃ: ৪৬৮।

১৪. সৈয়দ আকরম হোসেন, 'বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫, পৃ: ৭২।

১৫. শিশির কর, 'নিষিদ্ধ নজরুল', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯২, পৃ: ১০-১১।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় বিভেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

ধর্ম যে যুগে যুগে মানব সভ্যতার আশীর্বাদ হিসেবে কাজ করেছে তা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য। আবার ধর্মের নামে অধর্মের কাজও যে হয়েছে তাও ইতিহাসসম্মত এবং উল্লেখযোগ্য। ধর্মকে কেন্দ্র করে ইউরোপে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ হয়েছে। ধর্মকে কেন্দ্র করে সুদীর্ঘকালব্যাপী ক্রুসেডের কথাও স্মরণযোগ্য। ক্রুসেডে হাজার হাজার মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে। ধর্মকে কেন্দ্র করে এ ভারতীয় উপমহাদেশেও হিন্দুতে বৌদ্ধতে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটেছে। পরবর্তীকালে এদেশে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পরও একই কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে। এমনি এক ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থানে অবস্থিত ভারতে নজরুল এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসলামী আচার-রীতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করে ধর্মীয় শিক্ষালাভ করলেও নিজেকে ধর্মের রীতি-নীতির সীমানায় আবদ্ধ করেননি। ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁর 'নজরুল-চরিতমানস' গ্রন্থে লিখেছেন, 'যেখানে কীর্তন হত, কথকতা হত, যাত্রাগান হত, মৌলবীর কোরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা হত, দুরন্ত বালক গভীর আগ্রহ ও মনোযোগের সঙ্গে সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। বাউল, সুফী, দরবেশ ও সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গ ভাবে মিশতেন।'[১] জীবিকার্জনের উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে যে ক্ষেত্রে পা রাখেন সেখানেও সাফল্য পাওয়ার জন্য তাঁকে নিজ ধর্মের সীমানা অতিক্রম করে ভিন্ন আচার-রীতি ও পুরাণ-কাহিনী সমৃদ্ধ ধর্মীয় ক্ষেত্রে পদার্পন করতে হয়। লেটোদলে গান রচনা করে জীবিকার্জনের জন্য তিনি হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের ইতিহাস-ঐতিহ্য-পুরাণ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে বাধ্য হয়েছেন। আর এ বাধ্যবাধকতাই পরবর্তীতে তাঁকে অনুসন্ধিৎসু করে তুলেছে এবং তিনি ব্যাপক বিস্তৃত পটভূমির মাঝখানে এসে দাঁড়াতে পেরেছেন। হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের সারাৎসার উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর হৃদয়ে সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার একটা স্থায়ী আসন তৈরী হয়েছিল— যা মনুষ্যপ্রেমে উজ্জ্বল।

নজরুল আজীবন দুঃখের ভেতর দিয়ে কাল অতিবাহিত করেছেন। শৈশবে অর্থনৈতিক ও পারিবারিক সঙ্কটের পাশাপাশি স্নেহ-ভালবাসার স্বল্পতায় ভেতরে ভেতরে নিঃস্ব নজরুল ভালবাসার সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। তাঁর এ আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়েছে হিন্দু- মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মনুষ্যত্বের অধিকারী মানুষের সংস্পর্শে এসে। সম্প্রদায়ভেদে মানুষের কাছ থেকে অকুণ্ঠ ভালবাসা পেয়ে তাঁর হৃদয়ে অভিনব বোধের জন্ম নেয়। ফলে তিনি ধর্মের বাহ্যিক আড়ম্বরকে স্বীকৃতি না দিয়ে মুখ্যত স্বীকৃতি দেন মনুষ্যত্বকে, মানবিক গুণাবলীকে। শৈশব- কৈশোরের এই হৃদয়গত বোধ পরবর্তী জীবনেও বিস্তৃতি লাভ করে। তাই কোন ধর্মেরই আজীবন আচরিত রীতি-নীতির ধারায় নিজেকে পরিচালিত করেননি। ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। ধর্মীয় রীতি-নীতির বাহ্যিক আড়ম্বর তাঁকে মুগ্ধ করতে পারেনি। তাঁর বিশ্বাস ছিল মানবধর্মে। এ মানবধর্মের সন্ধান ও প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন।

নজরুল এমন এক রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রেক্ষাপটে আবির্ভূত হন যখন নিজস্ব ধর্মীয় ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে অসাম্প্রদায়িক মানসিকতায় লেখনী ধারণ অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল।ধর্মীয় পুনর্জাগরণের সেই দিনগুলোতে উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত সমসাময়িক সাহিত্যিকগণের অধিকাংশই কেবল নিজ

Dhaka University Institutional Repository

নিজ ধর্মীয় ঐতিহ্য উপস্থাপনা এবং ধর্মীয় মাহাত্ম্য বর্ণনা করে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেই পরিবেশেই মানসিক স্বাতন্ত্র্যের বলিষ্ঠতার কারণে নজরুল গেয়ে উঠলেন অসাম্প্রদায়িকতা ও সম্মিলনের গান। বলা বাহুল্য, সময়ের বিবেচনায় তাঁর এ ভূমিকা একই সঙ্গে বিস্ময়কর, দুঃসাহসী এবং অভূতপূর্ব। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও মানুষকে ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে মানুষ হিসেবে দেখার বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে, যার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে। মানুষকে ধর্মীয় পরিমণ্ডলের বাইরে বিচার করার স্বাভাবিক ক্ষমতা ও উপলব্ধিই তাঁকে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার সময় মুসলমান অধ্যুষিত এলাকার ভেতর দিয়ে নির্ভয়ে যাওয়ার অধিকার ও সাহস দিয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেয়ে আরো উদার দৃষ্টিভঙ্গি আর মানবিক চেতনার সঙ্গে মুক্তবুদ্ধি নিয়ে সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হন নজরুল। মুসলমান সমাজের অতীত ঐতিহ্য ও হিন্দুর পুরাণকাহিনীকে অবলম্বন করে উভয় সম্প্রদায়কে ভণ্ডামী, দুর্নীতি, সর্ব প্রকার জড়তা ও বন্ধ্যাত্বের নিগড় থেকে মুক্ত করে জাগাতে চাইলেন নবজীবনের উন্মাদনায়; মানবিকতা ও একতা যার মূলকথা; যাতে পরাধীনতার বিরুদ্ধে সমবেতভাবে আন্দোলন পরিচালনা করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ধর্মের নামে যেকোন ধরণের মিথ্যাচার, ভণ্ডামী, সংকীর্ণতা; সর্বোপরি ধর্মান্ধতার নাগপাশ ছিন্ন করে তিনি ধর্মের সার সত্য 'প্রেম'কে মানবাত্মার অক্ষয় ও অনিবার্য সম্পদ হিসেবে পেতে আগ্রহী। ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের ইতিহাস ও পুরাণের সঙ্গে আশৈশব ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে অন্তরে উপ্ত অসাম্প্রদায়িকতার যে ক্রমবিকাশ কিশলয় ও মহীরুহ রূপে, তার পরিচর্যায় তিনি দৃঢ়মূল। এ প্রেক্ষিতে তাঁর অনড় মানসিকতার কারণে কোন প্রতিকূলতাই তাঁকে তা থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। কেননা, সব ধর্মের মূলকথা মানবধর্ম; নজরুল এ সত্যকে মর্মে মর্মে অনুধাবন করেছেন। তাই তাঁর বিশ্বাস এ বাস্তব সত্যবোধে নিবদ্ধ ছিল। আর একারণেই ভিন্ন ধর্মমতে বিশ্বাসী নারীকে বিয়ের মুহূর্তে বন্ধু-বান্ধব কর্তৃক কনেকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়ে নেয়ার প্রস্তাব উত্থাপিত হলে নজরুল বলেন-

'কারুর কোনো ধর্মমত সম্বন্ধে আমার কোনো জোর নাই। ইচ্ছে করে তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলে, পরেও করতে পারবেন।'

উপর্যুক্ত বক্তব্যে নজরুল সব গণ্ডি ছাড়ানো 'মানুষের ধর্ম'কে অবলম্বন করেছেন।

হিন্দু নারীকে বিয়ে করার দায়ে পরবর্তীতে তিনি অত্যাচারিত হয়েছেন গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ ও মুসলমান কর্তৃক। প্রমীলা দেবীকে বিয়ে করার পর ধর্মীয় অভেদতত্ত্ব তাঁর মনকে নাড়া দেয়। তিনি নিজের ধর্মের পাশাপাশি অপর একটি স্বতন্ত্র ধর্মের স্বরূপ উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে নিপীড়িত মানুষের মধ্যে তিনি কাউকে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান বলে স্বতন্ত্রভাবে বিভাজন করেননি। ফলে সাম্প্রদায়িকতার বীভৎস-কর্কশ কণ্ঠ তাঁকে 'কাফের' কিংবা 'উন্মাদ' আখ্যা দিয়েও তাঁর হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির সংগ্রাম বন্ধ করতে পারেনি। অসাম্প্রদায়িকতার যে উজ্জ্বল আলো তাঁর হৃদয় আঙিনাকে উদ্ভাসিত করেছে তা তাঁকে আজীবন জাগরিত ও মুখরিত রেখেছে। তাঁকে ন্যায়নিষ্ঠ, সাহসী ও বিপ্লবী সৈনিকে পরিণত করেছে।

নজরুল ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকা হাতে নিয়ে সাহিত্যের আসরে আবির্ভূত হন বলে তিনি তাঁর সাহিত্যে হিন্দু কিংবা মুসলিম ঐতিহ্য উপস্থাপনার মাধ্যমে হিন্দু কিংবা মুসলিম সমাজকে পরস্পরের প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

বিক্ষুব্ধ করে তোলেননি। বরং উভয় ধর্মের মূল সত্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেই রচিত হবে ঐক্য— এ বিষয়ে তিনি নির্দ্বন্দ্ব ও স্থির মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। যেকোন ধর্মের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও হৃদয়হীন রীতিশাসনকে ঘৃণা করার পাশাপাশি তিনি সব ধর্মের শাশ্বত ও কল্যাণকর আদর্শগুলো উপস্থাপন করতে সচেষ্ট ছিলেন। এতে তাঁর নিজস্ব ধর্মমত অন্য ধর্মমত ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। টমাস পেন যেমন বলেছিলেন- 'My country is the world, and my religion to do good.' নজরুলের স্বতন্ত্র ধর্মও প্রতিটি ধর্মের ধর্মীয় গোষ্ঠীর মিলনাকাঙ্ক্ষী এবং এক্ষেত্রে তিনি প্রত্যক্ষ বিপ্লবের মাধ্যমে মানবকল্যাণ সাধনে প্রত্যয়ী। একারণে বর্তমানকে পুনর্নির্মাণে নজরুল মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্য স্মরণ করতে গিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের কথা বিস্মৃত হননি। তাই ইসলাম ধর্মের শাশ্বত আদর্শকে সাহিত্যের উপজীব্য করলেও অন্য ধর্মের শাশ্বত আদর্শকে কখনোই সাম্প্রদায়িক চিন্তার বশবর্তী হয়ে আক্রমণ করেননি। যদিও নজরুল মানুষকে ইসলামের সাম্যমন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণের জন্য উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন কিন্তু তাই বলে অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষী মনোভাব প্রকাশ করেননি। নজরুল হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বিত চিত্র উপস্থাপন করেছেন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নি-বীণা'র 'প্রলয়োল্লাস', 'রক্তাম্বরধারিণী মা', 'আগমনী', 'রণ-ভেরী', "শাত্-ইল্-আরব' 'মোহর্‌রম' প্রভৃতি কবিতায়। তিনি মুসলমানকে জাগাতে চেয়েছেন এবং হিন্দুকে আহবান জানিয়েছেন সমগ্র সমাজ জীবনে পরিবর্তন আনার আকাঙ্ক্ষায়। মানবিকতা ও বৃহত্তর মানবতার কল্যাণ, এ দুয়ের যুগপৎ বিকাশের ব্যাপারে তিনি যে সচেতন ছিলেন, তা তাঁর বিভিন্ন রচনায় সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত ও বিধৃত। নজরুল মানস ধর্মকে অস্বীকার করার পক্ষপাতী নয়।কিন্তু তাই বলে ধর্মের বাহ্যিক আড়ম্বরও সমর্থন করেননি। তিনি ধর্মকে আত্মশুদ্ধির আলোকিত জগতে উত্তরণের ক্ষেত্রে রীতি-নীতির সোপান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি আগ্রহ দেখিয়েছেন ধর্মের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যে ও বোধে; যে বোধ মানুষকে আচার সর্বস্ব ধর্মের নাগপাশ থেকে মুক্ত ক'রে পরিপূর্ণ জীবনের সন্ধান দেয়। তাই কবি ধর্মরক্ষার নামে হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও রক্তপাতের ঘোর বিরোধী। অপরাপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেই নজরুল তাঁর সাহিত্যে বিবেকী মানবতার কর্ষণের দ্বারা বিশৃঙখলা ও হিংসাবৃত্তি দূরীভূত করতে চেয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন—

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেল্‌ছে জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া॥

(জাতের বজ্জাতি/ বিষের বাঁশী)

ছুঁলেই যদি জাত যায় তবে-

যে জাত-ধর্ম ঠুন্‌কো এত,
আজ নয় কাল ভাঙবে সে ত,
যাক্ না সে জাত জাহান্নামে, রইবে মানুষ, নাই পরোয়া॥

(জাতের বজ্জাতি/ বিষের বাঁশী)

Dhaka University Institutional Repository

কেবলমাত্র নিজ সম্প্রদায়ের পরিচয় দিয়ে ইহলৌকিক ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রচেষ্টায় অযাচিত রক্তপাত, তাঁর কাছে ক্ষমাহীন অন্যায়। ধর্ম ও সমাজ জীবনের এই গ্লানিকর কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা ও আন্তরিক ঘৃণা জাজ্বল্যমানঃ

মনু ঋষি অণুসমান বিপুল বিশ্বে যে বিধির,
বুঝ্‌লি না সেই বিধির বিধি, মনুর পায়েই নোয়াস্ শির।
ওরে মূর্খ ওরে জড়,
শাস্ত্র চেয়ে সত্য বড়,
(তোরা) চিন্‌লি নে তা চিনির বলদ, সার হ'ল তাই শাস্ত্র বওয়া।

(জাতের বজ্জাতি/ বিষের বাঁশী)

কবি ধর্মের পরিচয়কে অগ্রাহ্য করে মানুষকে সর্বোচ্চ আসনে দেখতে প্রয়াসী। তিনি বিশ্বাস করেন এ বিশ্বের স্রষ্টা একজনই এবং তিনি সবার জন্য সমান। তাঁর কাছে জাতের কোন ভেদাভেদ নেই। তিনি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হলেও মূলতঃ তাঁর স্বরূপ অভিন্ন। অতএব ধর্মের কোলাহল নিরর্থক:

সকল জাতই সৃষ্টি যে তাঁর, এ বিশ্ব-মায়ের বিশ্ব- ঘর,
মায়ের ছেলে সবাই সমান, তাঁর কাছে নাই আত্ম পর।

(জাতের বজ্জাতি/ বিষের বাঁশী)

আসলে সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে স্রষ্টার আরাধনা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। জাতের দোহাই দিয়ে মানুষকে পর করা বোকামি।

নারায়ণের জাত যদি নাই,
তোদের কেন জাতের বালাই?
(তোরা) ছেলের মুখে থুথু দিয়ে মা'র মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া॥

(জাতের বজ্জাতি/ বিষের বাঁশী)

আসলে,

জাতের চেয়ে মানুষ সত্য,
অধিক সত্য প্রাণের টান,
প্রাণ-ঘরে সব এক সমান।

(সত্য-মন্ত্র/ বিষের বাঁশী)

কবির মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনা বিকাশের পেছনে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে পরাধীন দেশমাতৃকার মুক্তি-চিন্তা। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রদায়গত

Dhaka University Institutional Repository

কলহ-বিবাদ জাতিগত সম্প্রীতিতে যে ফাটল ধরিয়েছে, তা দেশের স্বাধিকার আন্দোলনের পথকে করছে দীর্ঘায়িত। এই বোধ থেকেই তাঁর হৃদয় উৎসারিত পঙ্‌তিমালা ভারতবাসীকে জাগরিত করার অভিপ্রায়ে মুখরিত। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি এবং এ সম্প্রীতিকে সুদৃঢ় রূপ দেয়ার জন্য তাঁর মধ্যে যে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তার উৎস তাঁর নিখাদ বা নির্ভেজাল দেশাত্মবোধ:

(ঐ) বিশ্ব ছিঁড়ে আনতে পারি, পাই যদি ভাই তোদের প্রাণ।

(তোরা) মেঘ-বাদলের বজ্রবিষাণ (আর) ঝড়-তুফানের লাল নিশান ॥

(মিলন-গান/ ভাঙার গান)

কবি ধর্মের পরিচয়ের পরিবর্তে দুশমনকে নিঃশেষ করার জন্য সবাইকে একসাথে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রস্তাব করেছেন:

চাই না ধর্ম, চাই না কাম,

চাই না মোক্ষ, সব হারাম

আমাদের কাছে : শুধু হালাল

দুশ্‌মন-খুন্ লাল-সে -লাল॥

(দুঃশাসনের রক্ত- পান/ ভাঙার গান)

দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা এমনকি ব্যক্তি স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রেও কবি নজরুল ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের অংশগ্রহণকে স্বশ্রদ্ধ চিত্তে আহবান করেছেন। এক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জনের কথা স্মরণ করা যায়। 'জীবন-গঙ্গা তৃষাতুর তরে' তাঁর আগমন ঘটেছিল এবং এ কারণেই তিনি নজরুলের শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি 'দেবতা কি আওলিয়া' সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও কবির ধারণা—

তোমারে দেখিয়া কাহারো হৃদয়ে জাগেনি ক' সন্দেহ

হিন্দু কিম্বা মুসলিম তুমি অথবা অন্য কেহ।

(ইন্দ্র-পতন/ চিত্ত-নামা)

তথাপি তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে- তিনি দেশবন্ধু, মানববন্ধু, দীনবন্ধু। তাঁকে পয়গম্বর, অবতার, নারায়ণ, ঋষি, সোহম্‌স্বামী, শিব-বিষ্ণু, বুদ্ধ এমনকি নবযুগের হরিশ্চন্দ্র বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষকে তিনি আপন ভাবতে পেরেছেন। আকবর যেমন হিন্দুর, আরংজিব তেমনি মুসলমানের। কিন্তু চিত্তরঞ্জন সম্পর্কে নজরুলের ঘোষণা-

তুমি আর্তের, তুমি বেদনার, ছিলে সকলের তুমি,

(ইন্দ্র-পতন/ চিত্ত-নামা)

আর এই 'সকলের তুমি' দ্বারাই কবি নজরুল ধর্ম সম্পর্কে চিত্তরঞ্জনের মনোভাব এবং একই সঙ্গে তাঁর নিজেরও অনুভূতি ফুটিয়ে তুলেছেন। মানবকল্যাণই নজরুলের ধর্ম। হিন্দুও নয়, ইসলামও নয়।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল ইসলাম সারাজীবন তাঁর সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে সার্বজনীন মানবতাবাদের কথাই ব্যক্ত করেছেন। তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের নাম 'সাম্যবাদী'। এ কাব্যগ্রন্থে কবি ধর্মাধর্ম বর্ণগোত্র নির্বিশেষে মানুষেরই মহিমা ঘোষণা করেছেন। 'সাম্যবাদী' কবিতার প্রথমেই আছে —

গাহি সাম্যের গান —

যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,

যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ক্রীশ্চান।

(সাম্যবাদী/সাম্যবাদী)

মসজিদ, মন্দির, কোরান, পুরাণ, বেদ- বেদান্ত, বাইবেল, ত্রিপিটক, জেন্দাবেস্তা, গ্রন্থসাহেব- এর চেয়েও যে মানুষ মহান ও পবিত্র স্পষ্ট কণ্ঠে কবি তা ঘোষণা করেছেন। এখানে নজরুলের প্রধান ধর্ম মানবধর্ম, অন্য কিছু নয়। মানুষই তাঁর একমাত্র আরাধ্য। আর এ মানুষ কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বী নয়। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান- অর্থাৎ সব মানুষই ধর্মাধর্মের উর্ধ্বে। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'হোমশিখা' কাব্যগ্রন্থের 'সাম্য-সাম' কবিতায় দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন,-

মানি না গির্জা, মঠ, মন্দির, কল্কি, পেগম্বর,

দেবতা মোদের সাম্য-দেবতা অন্তরে তাঁর ঘর;

মসজিদ, মন্দির, গির্জা প্রভৃতি ভজনালয়ে ভগবান নেই— ভগবান বিরাজ করছেন মানুষের হৃদয়ের অন্তর্মহলে। নজরুল এই মহাসত্যকে তাঁর কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন —

তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,

সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ!

তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,

তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।

(সাম্যবাদী/সাম্যবাদী)

অন্যত্র,

এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,

বুদ্ধ-গয়া এ , জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন,

মস্‌জিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,

এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।

(সাম্যবাদী/সাম্যবাদী)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে কবির চূড়ান্ত ঘোষণা —

এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির কাবা নাই।

(সাম্যবাদী/সাম্যবাদী)

এই হৃদয়-মন্দিরেই ঈশ্বর তথা স্রষ্টা বিরাজ করেন। অন্যত্র তাঁকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। তাঁর সন্ধান লাভ করতে হলে মানুষের মধ্যেই তাঁকে খুঁজে পেতে হবে। কোন বিশেষ স্থানে তাঁর উপস্থিতি আশা করা এবং সন্ধানে তৎপর হওয়া বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। 'ঈশ্বর' কবিতার শেষে কবির দিক নির্দেশনা —

শাস্ত্র না ঘেঁটে ডুব দাও সখা, সত্য -সিন্ধু- জলে।

(ঈশ্বর/সাম্যবাদী)

নজরুল ধর্মীয় গ্রন্থের চেয়ে হৃদয়কে বড় স্থান দিয়েছেন। মানুষের মুক্ত হৃদয়ই তার প্রকাশভঙ্গির সবচেয়ে বড় তীর্থস্থান, যেখানে সব মানুষ হৃদয়ের বন্ধন বিছিয়ে রচনা করতে পারে মানবিক সম্পর্কের দৃঢ় বন্ধন। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ধর্মের আবরণ অপসারণ করে মানুষ ও তার আত্মাকে কবি বড় করে দেখেছেন, শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মনুষ্যত্বের বিকাশকে। 'মানুষ' কবিতায় কবির এই মনোভাব প্রকাশিত।

গাহি সাম্যের গান —
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্!
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।—

(মানুষ/সাম্যবাদী)

নজরুল বিশ্বমানবের কবি, পতিত নিপীড়িত মানবের কল্যাণই নজরুল সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। নজরুল মনে করেন মানুষ মানুষের জন্য। কোন গোষ্ঠীগত, দলগত কিংবা বিশেষ ধর্মীয় চৌহদ্দির মধ্যে মানুষ তার চিন্তাধারাকে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনা। মানুষের ধর্ম একই, এই ধর্ম মানবতার ধর্ম। পরস্পর পরস্পরের দুঃখ-কষ্টে আপ্রাণ সাহায্য করাই এই মানবধর্মের মূলনীতি। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সী ইহুদীতে কোনই ভেদাভেদ নেই। মানবের সেবাই এদের সবার মূল উদ্দেশ্য। 'মানুষ' কবিতার কয়েকটা চরণে এই মানবতার পূর্ণ বিকাশ হয়েছে।

তেরিয়াঁ হইয়া হাঁকিল মোল্লা—"ভ্যালা হ'ল দেখি লেঠা,
ভুখা আছ মর গো-ভাগাড়ে গিয়ে! নামাজ পড়িস বেটা?"

(মানুষ/সাম্যবাদী)

ঈশ্বর সান্নিধ্যই ধর্মাচরণের মূল কথা বলে ধরে নেয়া হলেও মানুষকে পরোক্ষ করে তাঁকে পাওয়া সম্ভব নয়। কেননা ঈশ্বর উপাসনাগারের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ নন। এমনকি শুধু কোরআনে-পুরাণে,বেদে- বাইবেলেও তাঁকে পাওয়া সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যেই তাঁর সন্ধান লাভ সম্ভবপর। মূর্খের ন্যায়

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের অমর্যাদা করে গ্রন্থ-কেতাব বুকে ধারণ করলেই ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ সম্ভব নয়। কারণ গ্রন্থ- কেতাবের স্থান মানুষের উচ্চে হতে পারে না। আসলেই 'গ্রন্থ মানুষের জন্য- মানুষ গ্রন্থের জন্য নয়।' কবির ভাষায় —

মানুষেরে ঘৃণা করি'
ও' কা'রা কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি'
ও' মুখ হইতে কেতাব-গ্রন্থ নাও জোর ক'রে কেড়ে,
যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে।
পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল। - মূর্খরা সব শোনো,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ; - গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো!

(মানুষ/সাম্যবাদী)

পূর্ববর্তী কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'জাতির পাঁতি' কবিতায় সারা বিশ্বের মানব সম্প্রদায়কে 'এক জাতি' বলে ঘোষণা দিয়েছেন-

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি;

('জাতির পাঁতি/ 'অভ্র-আবীর')

মানুষের বাহ্যিক আকার ও প্রকারগত পার্থক্য থাকলেও প্রকৃতপক্ষে মানুষ একই উপাদানে গঠিত এবং সমমর্যাদার অধিকারী। এক্ষেত্রে অন্য কোন প্রকারের পার্থক্য কবি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন —

কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবারি সমান রাঙা।

(জাতির পাঁতি/ 'অভ্র-আবীর')

সত্যেন্দ্রনাথ ধর্মের, বর্ণের, বৃহৎ বা ক্ষুদ্রের ভেদাভেদকে মানতে পারেননি।

নজরুলের মধ্যেও সত্যেন্দ্রনাথের আদর্শের প্রতিফলন দেখা যায়।

নজরুল সাম্যবাদী কবি। তাঁর পরিকল্পিত সাম্য রাজ্যে সব মানুষ সমান; তাদের মধ্যে ধর্মীয় ব্যবধান নেই, বর্ণের বিভেদ নেই।

নাই কো এখানে কালা ও ধলার আলাদা গীর্জা -ঘর,
নাই কো পাইক- বরকন্দাজ নাই পুলিশের ডর।
এই সে স্বর্গ, এই সে বেহেশ্‌ত্‌, এখানে বিভেদ নাই,
যত হাতাহাতি হাতে হাত রেখে মিলিয়াছে ভাই ভাই!
নেই ক' এখানে ধর্মের ভেদ শাস্ত্রের কোলাহল,
পাদরী-পুরুত- মোল্লা- ভিক্ষু এক গ্লাসে খায় জল।

(সাম্য/ সাম্যবাদী)

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল কোন বিশেষ জাতির কবি নন। জাতিভেদ তার কাছে নেই, তিনি সমগ্র পৃথিবীর অখণ্ড মানব জাতির কবি—নিপীড়িত, নির্যাতিত মানবতার মুক্তির সাধক সমস্ত ধর্মের নির্যাসকে তিনি গ্রহণ করেছেন।

"হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?

কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।

(কাণ্ডারী হুঁশিয়ার/ সর্বহারা)

মানুষকে ভালবাসতে গিয়ে কবি ভৌগোলিক সীমারেখার বন্ধন অতিক্রম করে গেছেন। একটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী এ কারণে তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের সঙ্কীর্ণতাকে আঘাত করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। 'সর্বহারা' কাব্যের 'আমার কৈফিয়ত' কবিতায় তার স্বাক্ষর বিধৃত।

মৌ-লোভী যত মৌলবী আর 'মোল্-লা'রা কন হাত নেড়ে',

'দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জা'ত মেরে।

ফতোয়া দিলাম- কাফের কাজী ও,

যদিও শহীদ হইতে রাজি ও!

'আমপারা'- পড়া হাম্‌বড়া মোরা এখনো বেড়াই ভাত মে'রে!'

হিন্দুরা ভাবে, পার্শী শব্দে কবিতা লেখে, ও পা'ত- নেড়ে!

(আমার কৈফিয়ত/সর্বহারা)

শুধু কবিতা নয়, অনেক গানেও মানবতাবোধসঞ্জাত হিন্দু- মুসলমান সম্প্রীতি অন্বেষণ করেছেন নজরুল। কামনা করেছেন সর্বাত্মকভাবে সাম্যবাদের। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় হয়েছেন উদ্দীপ্ত। সনাতনী শাস্ত্রাচার অনুভূত হয়েছে অনাদিকালের শৃঙ্খলরূপে। শনাক্ত হয়েছে মূল সর্বনাশের কারণ হিসেবে শাস্ত্রীয় প্রথাগত জীবনায়ন।

আদি শৃঙ্খল সনাতন শাস্ত্র-আচার

মূল সর্বনাশের, এরে ভাঙিব এবার!

(অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত/ ফণি-মনসা)

নজরুল অনুধাবন করেছেন উপাসনাগারের মত নমস্য পবিত্র স্থানও ঔদার্যের পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক হীনমন্যতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। পরিণত হয়েছে শয়তানের আড্ডাখানায়।

মসজিদ আর মন্দির ঐ শয়তানদের মন্ত্রণাগার,

রে অগ্রদূত, ভাঙতে এবার আসছে কি জাঠ কালাপাহাড়?

(পথের দিশা/ ফণি-মনসা)

Dhaka University Institutional Repository

অত্যাচারিতের কোন জাতিভেদ নেই। তার একটা মাত্র পরিচয় সে মজলুম। নির্যাতিত সে— এটাই বড় কথা। ভারতবাসীও নির্যাতিত, উৎপীড়িত। হিন্দু-মুসলমান বলে নির্যাতনের হেরফের নেই কিছু। জালিমের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে হিন্দু-মুসলমানের তুচ্ছ জাতিগত ভেদাভেদের কথা ভুলে যেতে হবে। ঘর রক্ষা করতে হবে আগে, বন্ধ রাখতে হবে ধর্ম কলহ। কারণ —

আসে ঘনঘটা ঝড়- বাদল।

(যা শত্রু পরে পরে/ ফণি-মনসা)

অতএব কবির পরামর্শ —

ঘর সাম্‌লে নে এই বেলা তোরা ওরে ও হিন্দু-মুস্‌লেমিন!
আল্লা ও হরি পালিয়ে যাবে না, সুযোগ পালালে মেলা কঠিন।
ধর্ম-কলহ রাখ্ দু'দিন!

(যা শত্রু পরে পরে/ ফণি-মনসা)

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বন্ধুত্বসুলভ সদ্ভাব তাঁর আকাঙ্ক্ষার ধন। তাঁর কামনা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন। এর বিপরীত চিত্র তাঁর মনে জন্ম দিয়েছে বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার। তবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনিবার্য সংঘাত-সংঘর্ষেও তাঁর এ ধরণের আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যু ঘটেনি। বরং মৃত্যুর বিভীষিকাময় ময়দানে দাঁড়িয়েও তাঁর মন নতুন স্বপ্ন রচনায় তৎপর। তাইতো পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির লক্ষ্যে উভয় সম্প্রদায় তাদের নিজ নিজ ভুল সংশোধনের মাধ্যমে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, এ প্রত্যাশা থেকে তিনি এক মুহূর্তের জন্যও নিজেকে দূরে রাখতে পারেননি:

যে-লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, পড়ে মন্দির- চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ গুঁড়া।
প্রভাতে হবে না ভায়ে- ভায়ে রণ,
চিনিবে শত্রু, চিনিবে স্বজন।
করুক কলহ- জেগেছে তো তবু- বিজয়- কেতন উড়া!
ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন, স্বর্ণলঙ্কা পুড়া!

(হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ/ফণি-মনসা)

'বাংলার "আজিজ" ' কবিতায় কবি নজরুল 'সবার "আজিজ" '- কথার মাধ্যমে তাঁর মানবতাবাদী মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছেন। মুসলমান ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আবার এসো সবার মাঝে শক্তিরূপে বীর,
হিন্দু- সবার গুরু ওগো, মুসলমানের পীর!

(বাংলার "আজিজ"/ সন্ধ্যা)

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মের নামে হীনমন্যতার প্রতি নজরুল ছিলেন খড়্গহস্ত। ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতাকে তিনি অধর্মের দৃষ্টিতে দেখে তার স্বরূপ উদঘাটনে প্রয়াসী হয়েছেন। ধর্ম মানুষের মনের ওপর যে সঙ্কীর্ণতার পরিধি গড়ে তুলেছে তার ওপর আঘাত করে তিনি মানুষকে প্রকৃত ধর্ম সাধনায় রত হতে আহবান জানিয়েছেন। 'সন্ধ্যা' কাব্যের 'শরৎচন্দ্র' কবিতার উদ্ধৃতি দিলেই নজরুলের এই মনোভাব স্পষ্ট হবে।

ধর্মের নামে যুধিষ্ঠির
"ইতি গজের" করুক ভান!
সব্যসাচী গো, ধর ধনুক-
হান প্রখর অগ্নিবাণ!
'পথের দাবী'র অসম্মান
হে দুর্জয়, কর গো ক্ষয়!
দেখাও স্বর্গ তব বিভায়
এই ধূলার ঊর্ধ্বে নয়!

(শরৎচন্দ্র/ সন্ধ্যা)

ধর্ম নিয়ে কলহ অনাকাঙ্ক্ষিত। মানুষের সৃষ্টির আদি ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় একই বৃন্ত থেকে মানুষের উৎপত্তি। অতএব ধর্ম নিয়ে বিভেদ হবে অত্যন্ত ঘৃণিত ব্যাপার। কবির ভাষায়-

এক আদমের মোরা সন্তান,
নাহি দেশ কাল ধর্মাভিমান,

(বিংশ শতাব্দী/ প্রলয়- শিখা)

অতএব কবির প্রার্থনা-

রবে না ধর্ম জাতির ভেদ
রবে না আত্ম-কলহ-ক্লেদ

(নতুন চাঁদ/ নতুন চাঁদ)

কারণ বিশ্বনিয়ন্তা একজনই। তাঁকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন। সবাই তাঁর সৃষ্টি, তাঁরই দেয়া আলো-বাতাসে পুষ্ট। তাঁর ক্ষমা যেমন সবাই প্রাপ্ত হয় তেমনি শাস্তিও হিন্দু-মুসলিম সবার ওপরেই আরোপিত হয় এবং;

সব ধর্মের সব মানব মরে তখন,
থাকে না হিন্দু- মুসলমানের আস্ফালন!

(নতুন চাঁদ/নতুন চাঁদ)

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ক্ষুধার যাতনা সবাইকেই ভোগ করতে হয়। অনাহারক্লিষ্ট মানুষের প্রতি কবির হৃদয় নিঙড়ানো দরদ প্রকাশিত হয়েছে শ্রেণী-ধর্ম- বর্ণ নির্বিশেষে।

আগুন জ্বলে না মাসে কত দিন হায় ক্ষুধিতের ঘরে,
ক্ষুধার আগুনে জ্বলে কত প্রাণ তিলে তিলে যায় মরে।
বোঝে না ধনিক, হোক সে হিন্দু হোক সে মুসলমান,
আল্লা যাদের নিয়ামত্ দেন, পাষাণ তাদের প্রাণ!

(শোধ করো ঋণ/শেষ সওগাত)

এ বিশ্ব মানুষের আবাসস্থল। জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবাই এখানে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করবে এটাই স্বাভাবিক।কিন্তু লোভের বশবর্তী হয়ে যারা এ ধরায় অকল্যাণ আর অশান্তি সৃষ্টি করে তাদের ধর্ম-জাতির কোন পরিচয় নেই এবং তারা বিশ্বস্রষ্টা কর্তৃক শাস্তি প্রাপ্ত হয়। এক্ষেত্রে হিন্দু, খ্রীষ্টান বা মুসলমান হিসেবে কারো প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা হয় না। নজরুলের ভাষায় —

হউক হিন্দু, হোক ক্রীশ্চান, হোক সে মুসলমান,
ক্ষমা নাই তার, যে আনে তাহার ধরায় অকল্যাণ!

(একি আল্লার কৃপা নয়/শেষ সওগাত)

ধর্মকে নজরুল দেখেছেন আনুভূতিক প্রকাশের শুভ্র আদর্শময় দিক হিসেবে। ধর্মভ্রষ্ট অর্থে তাঁর কাছে আদর্শহীনতা ও হৃদয়ের ব্যভিচার। 'শেষ সওগাত' কাব্যের 'গোঁড়ামি ধর্ম নয়' কবিতায় কবির এই মনোভাবের স্বাক্ষর মুদ্রিত।

শুধু গুণ্ডামী ভণ্ডামী আর গোঁড়ামি ধর্ম নয়,
এই গোঁড়াদের সর্বশাস্ত্রে শয়তানী চেলা কয়।
এক সে স্রষ্টা সব সৃষ্টির এক সে পরম প্রভু,
একের অধিক স্রষ্টা কোনো সে ধর্ম কহে না কভু।

(গোঁড়ামি ধর্ম নয়/শেষ সওগাত)

'ট্রেড শো' কবিতায় হিন্দু-মুসলমানের মিলন-বন্দনা কবির চেতনায় প্রতিধ্বনিত। তিনি রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র বসু ও জহরলাল নেহরুর অবতরণিকার মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানের বন্দনা-গীতি গেয়েছেন।

হিন্দু- মুসলমানের এমন মিলন দেখিনি আর,
বিড়িওলা আর অফিসের বাবু হয়ে গেছে একাকার।
টিকিতে দাড়িতে জড়াজড়ি হয়, ছড়াছড়ি পান-বিড়ি,
কোট-প্যান্ট- লুঙ্গি-ধুতি ঠাসাঠাসি সারা ফুটপাথ সিঁড়ি।

(ট্রেড শো/ কবিতা ও গান)

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ কবিকে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় ব্যথিত করেছে। 'দাঙ্গা' কবিতায় তার প্রকাশ লক্ষণীয়।

এল কুৎসিত ঢাকার দাঙ্গা আবার নাঙ্গা হয়ে;
এল হিংসার চিল ও শকুন নখর চঞ্চু লয়ে!
সারা পৃথিবীর শ্মশানের ভূত- প্রেতেরা সর্বনেশে
ঢাকার বক্ষে আখা জ্বালাইতে জুটেছে কি আজ এসে?

(দাঙ্গা/ কবিতা ও গান)

কবি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন হিন্দু- মুসলমানের দাঙ্গা নিজেদের অকল্যাণের বোঝাই কেবল ভারী করে চলেছে। এই দু' সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যতরকম কল্যাণ হতে পারত তার সবই ব্যর্থতায় রূপ নিচ্ছে নিজেদের মধ্যে হানাহানির ফলে। নিজেদের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের জন্য এরা নিজেরাই দায়ী। উভয় সম্প্রদায়ের তথা সমগ্র জাতির অকল্যাণেরও প্রধান কারণ হচ্ছে এই সাম্প্রদায়িক বিরোধ।

জাতির দেশের অকল্যাণের ইহারাই আজ হেতু,
বাঁধিতে দেয় না ইহারাই মহা- মিলনের প্রেম- সেতু।

(দাঙ্গা/ কবিতা ও গান)

তাই কবি দেশের তথা জাতির সার্বিক মুক্তির লক্ষে দু'ধর্মের মানুষের একটা মিলন সূত্র রচনা করতে চেয়েছেন। নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত স্মরণ করে কবি একটা অভিন্ন ধর্ম আশা করেছেন। তাঁর ভাষায়-

আমরা আনিব অভেদ ধর্ম, নব বেদগাথা শ্লোক॥
চীন ভারতের জয় হোক!
ঐক্যের জয় হোক!
সাম্যের জয় হোক!

(সাম্যের জয় হোক/ কবিতা ও গান)

নজরুল ইসলামের কবিতার পাশাপাশি উপন্যাস ও প্রবন্ধেও ধর্ম সম্পর্কে অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতিফলন বিশেষ লক্ষণীয়।

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে প্যাঁকালে ও কুর্শির প্রেমজীবনের মধ্য দিয়ে নজরুল ধর্মের প্রাচীর অতিক্রান্তির পথ নির্দেশ করেছেন। প্যাঁকালে ও কুর্শির ধর্মীয় আস্তরণ স্বতন্ত্র হলেও কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়কের এই তরুণ-তরুণী পরস্পরকে ভালবাসতে কুণ্ঠিত হয়নি। এখানেও লক্ষণীয় একটি মুক্তাঙ্গন, যেখানে মুসলমান, হিন্দু ও খ্রীষ্টান পরিবার পরস্পরের সুখ-দুঃখ বিনিময় করে নিজেদের জীবনে মানবতাবোধের একটি শান্তির প্রচ্ছায়া বিস্তার করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

'কুহেলিকা' উপন্যাস মূলতঃ জাহাঙ্গীর ও তাহমিনার প্রেমবৃত্ত কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও সমকালীন বিপ্লববাদের সূত্র ধরে প্রমত্ত ও চম্পা অন্যতম চরিত্ররূপে অন্তর্ভুক্ত। বিপ্লবী দলে মুসলমানদের অংশগ্রহণে অনীহা এবং তাদের দলভুক্ত না করা প্রসঙ্গে বিপ্লবী সদস্যদের মতো বৈষম্যের পাশাপাশি প্রমত্তের সহনশীল অসাম্প্রদায়িক মনোভাব জাহাঙ্গীরকে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত করতে সহায়তা করেছে। জাহাঙ্গীর প্রেম ও দাম্পত্য জীবনের সুখময়তার পরিবর্তে দেশোদ্ধারের মহান ব্রতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।ট্রেনে চম্পার প্রতি তার দুর্বলতাও বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। প্রমত্ত ও অনিমেষের সংলাপের মধ্য দিয়ে লেখকের মনোভাব প্রকাশিত।

প্রমত্তঃ ধর্ম ওদের আলাদা হলেও এই বাঙলারই জলবায়ু দিয়ে ত ওদেরও রক্ত-অস্থি-মজ্জার সৃষ্টি। যে শক্তি যে তেজ যে ত্যাগ তোমাদের মধ্যে আছে, তা ওদের মধ্যেই বা থাক্‌বে না কেন?

অনিমেষঃ সে হিন্দু কি মুসলমান, তা ভেবে দেখিনি। তাকে আমি দেখেছি মানুষ হিসাবে। সে হিসাবে সে আমাদের সকলের চেয়েই বড়। ... আমরা বিপ্লববাদী, কিন্তু গোঁড়ামিকে আজও পেরিয়ে যেতে পারিনি—ধর্মকে বাদ দিয়ে মানুষকে দেখতে শিখিনি।

প্রমত্তঃ ওরে, ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানের মস্‌জিদের ভারতবর্ষ নয়—এ আমার মানুষের— মহা- মানুষের মহাভারত!

তাহমিনাদের বাড়ি থেকে দেশে ফেরার সময় জাহাঙ্গীর জয়তীর বাড়িতে গিয়ে হিন্দু-মুসলমানদের প্রীতি বন্ধনের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়। পরবর্তীকালে তাহমিনাকে বিয়ের পর ট্রেন থেকে চম্পার সঙ্গে পালিয়ে যায় দেশের মুক্তি সংগ্রামের আদর্শকে সামনে রেখে যেখানে চম্পা আর সে ধর্মের বিভেদ ভুলে গিয়ে মানবতার উদার মন্ত্রে দীক্ষিত হয় দেশমাতাকে উদ্ধারের সঙ্কল্পে।

ধর্ম সম্পর্কে সচেতন নজরুল তাঁর ধর্মীয় ভাবনাকে কবিতা ও উপন্যাসের মতো প্রবন্ধেও তুলে ধরেছেন। যার বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে উদারনৈতিক মানবিকতা সম্পৃক্ত অসাম্প্রদায়িক চেতনা। মুক্তবুদ্ধির আলোকে উদার দৃষ্টিভঙ্গিকে অঙ্গীভূত করে তিনি হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক, বিভেদের কারণ, ধর্মীয় গোঁড়ামির অশুভ দিকগুলো বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটা ন্যায়সঙ্গতিবোধ বিষয়ের মধ্যে প্রকাশিত। কবি মানুষকে গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন বলেই হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা তাঁর মন আলোড়িত করত। পৈশাচিক বর্বরতায় উন্মত্ত সেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ দিনগুলোতেও নজরুলের তেজস্বী ও অগ্নিদীপ্ত মন্ত্রণা 'মানুষকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা'র আহবানে উচ্চকিত। 'যুগবাণী' (১৯২২), দুর্দিনের যাত্রী' (১৯২৬), 'রুদ্রমঙ্গল' (১৯২৬)- গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে মানবধর্মের প্রতি তাঁর যে চিরন্তন আকুতি, তার পরিচয় বিধৃত। মুক্তবুদ্ধির বিকাশের দিক লক্ষ্য করা যায়'যুগবাণী' প্রবন্ধ সঙ্কলনের 'নবযুগ' প্রবন্ধেঃ

'আজ মহাবিশ্বে মহাজাগরণ, আজ মহামাতার মহাআনন্দের দিন, আজ মহামানবতার মহাযুগের মহাউদ্বোধন! আজ নারায়ণ আর ক্ষীরোদসাগরে নিদ্রিত নন। নরের মাঝে আজ তাঁহার অপূর্ব মুক্তি-কাঙাল বেশ। ঐ শোনো, শৃঙ্খলিত নিপীড়িত বন্দীদের শৃঙ্খলের ঝনৎকার।'

(নবযুগ/যুগবাণী)

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের মহামানবের মুক্তির দিনে দেশে সর্ব প্রকার বিভেদ আর অসাম্য পরিহারের জন্য নজরুল আহবান জানিয়েছেন। হিন্দু-মুসলমানের সংঘাত এই মিলনের পথে প্রতিবন্ধক। তাই ধর্ম নির্বিশেষে সবার প্রতি উদাত্ত আহবানঃ

'এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান! এস বৌদ্ধ! এস ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গণ্ডী কাটাইয়া, সব সঙ্কীর্ণতা, সব মিথ্যা সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি।'

(নবযুগ/যুগবাণী)

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড নজরুল ইসলামকে দারুণভাবে ব্যথিত করে। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে স্মরণে রেখে নজরুল ধর্ম নির্বিশেষে ভারতবাসীকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কেননা, এই নির্মম আচরণ সারা ভারতবাসীকে চেতনা দান করার জন্য যথেষ্ট। তাই নজরুলের কাঙ্ক্ষিত ধর্মীয় ভেদাভেদমুক্ত ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মহামিলনের পবিত্র দৃশ্য অবলোকনের জন্য ডায়ারকেও তিনি নিমন্ত্রণ করছেন। হিন্দু-মুসলমানের প্রতি তাঁর উদাত্ত আহবানঃ

'এস ভাই হিন্দু! এস ভাই মুসলমান! তোমার আমার উপর অনেক দুঃখ-ক্লেশ, অনেক ব্যথা-বেদনার ঝড় বহিয়া গিয়াছে; আমাদের এ বাঞ্ছিত মিলন বড় দুঃখের, বড় কষ্টের ভাই! খোদা যখন আমাদের জাগাইয়াছেন, তখন আর যেন আমরা না ঘুমাই।'

(ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ/ যুগবাণী)

'ছুঁৎমার্গ' প্রবন্ধেও নজরুল ইসলাম হিন্দু- মুসলমানের মিলনের প্রধান অন্তরায় হিসেবে এই ছোঁয়া-ছুঁয়ির জঘন্য ব্যাপারটাকেই চিহ্নিত করেছেন। মুসলমানদের 'বেদাৎ' বা মানুষের সৃষ্ট রীতি নীতির সংস্কারের কথা যেমন তিনি বলেছেন তেমনি হিন্দুদের তাঁর ভাষায় 'ছুঁৎমার্গরূপ কুষ্ঠরোগ' নিরাময়ের পদক্ষেপ গ্রহণেরও আহবান জানিয়েছেন।

ভারতের মুক্তি সাম্প্রদায়িক কলহের দুর্বলতা দিয়ে সম্ভব নয়। নজরুল জানতেন হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ শক্তির দুর্বার আঘাতেই ব্রিটিশ শাসন শৃঙ্খল ভাঙা সম্ভব। নজরুল আহবানও জানিয়েছেন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের। তবে তিনি বারবার স্মরণ করিয়েছেন, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য কেবল স্বার্থের প্রয়োজনে হলে তা ব্যর্থ হবে। সে মিলন, ঐক্য আবশ্যক আত্মিক উদারতার ভিত্তিতে। তাই ধর্ম নির্বিশেষে সবার প্রতি উদাত্ত আহবান মানবতার মহামিলনের-

'হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক, শুধু একবার এই মহাগগনতলের সীমা হারা মুক্তির মাঝে দাঁড়াইয়া—মানব! — তোমার কণ্ঠে সেই সৃষ্টির আদিম বাণী ফুটাও দেখি! বল দেখি, "আমার মানুষ ধর্ম।" দেখিবে, দশদিকে সার্বভৌমিক সাড়ার আকুল স্পন্দন কাঁপিয়া উঠিতেছে। এই উপেক্ষিত জন-সঙ্ঘকে বুক দাও দেখি, দেখিবে এই স্নেহের ঈষৎ পরশ পাওয়ার গৌরবে তাহাদের মাঝে ত্যাগের একটা কি বিপুল আকাঙ্ক্ষা জাগে! এই অভিমানীদিগকে বুক দিয়া ভাই বলিয়া পাশে দাঁড় করাইতে পারিলেই ভারতে মহাজাতির সৃষ্টি হইবে, নতুবা নয়। মানবতার এই মহা-যুগে একবার গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বল যে, তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্র নও, হিন্দু নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ— তুমি সত্য।'

(ছুঁৎমার্গ/যুগবাণী)

Dhaka University Institutional Repository

মন্দির ও মসজিদ যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের উপাসনালয়। এদের অবস্থানও পাশাপাশি। কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে উভয় সম্প্রদায়ে বাধে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। 'গণবাণী'তে ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ২৯ চৈত্র, শুক্রবারের কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে নজরুল 'মন্দির ও মসজিদ' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন—

"মারো শালা যবনদের!" "মারো শালা কাফেরদের।"—আবার হিন্দু-মুসলমানী কাণ্ড বাঁধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কথা-কাটাকাটি, তারপর মাথা-ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। আল্লার এবং মা কালীর "প্রেস্টিজ" রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চিৎকার করিতেছিল তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল, দেখিলাম— তখন আর তাহারা আল্লা মিয়া বা কালী ঠাকুরানীর নাম লইতেছে না। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে — "বাবা গো, মা গো!"— মাতৃ-পরিত্যক্ত দুটি বিভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া এক স্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মাকে ডাকে!

দেখিলাম, হত-আহতদের ক্রন্দনে মসজিদ টলিল না, মন্দিরের পাষাণ দেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদী চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিল।'

(মন্দির ও মসজিদ/ রুদ্র-মঙ্গল)

নজরুল সারা জীবন ধরে ধর্ম-মাতালদের আড্ডা ঐ মন্দির-মসজিদ ভেঙে সব মানুষকে এক আকাশের গুম্বজ-তলে নিয়ে আসার সাধনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর চেয়ে প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব আছেন বটে, কিন্তু ঔদার্যে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের খাঁটি কবি এ অর্থে একমাত্র নজরুলকেই বলা চলে। কারণ তিনি ধর্ম সম্পর্কে একটা স্থীর সীদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন যে,

'মানুষের কল্যাণের জন্য ঐ-সব ভজনালয়ের সৃষ্টি, ভজনালয়ের মঙ্গলের জন্য মানুষ সৃষ্ট হয় নাই।'

(মন্দির ও মসজিদ/ রুদ্র-মঙ্গল)

অতএব,

'আজ যদি আমাদের মাতলামির দরুন ঐ ভজনালয়ই মানুষের অকল্যাণের হেতু হইয়া উঠে— যাহার হওয়া উচিত ছিল স্বর্গমর্ত্যের সেতু— তবে ভাঙ্গিয়া ফেল ঐ মন্দির -মসজিদ! সকল মানুষ আসিয়া দাঁড়াইয়া বাঁচুক এক আকাশের ছত্রতলে, এক চন্দ্র- সূর্য- তারা -জ্বালা মহামন্দিরের আঙ্গিনাতলে!

(মন্দির ও মসজিদ/ রুদ্র-মঙ্গল)

আসলে মন্দির নয়, মসজিদ নয়, হিন্দু- মুসলমান নয়, নজরুলের আস্থা একমাত্র মানুষে। মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখার এই যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি তা যেমন তাঁকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করে তেমনি অন্যদিকে ধর্মের পোশাক থেকে বের করে মানুষকে নিয়ে আসে মনুষ্যত্বের মুক্ত গগনতলে। দূর করে দেয় টিকি- দাড়ির বিভেদ। নজরুলের ভাষায়—

Dhaka University Institutional Repository

'হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পণ্ডিত্ব! তেমনি দাড়িও ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব! এই দুই 'ত্ব' মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি! আজ যে মারামারিটা বেধেছে, সেটাও এই পণ্ডিত-মোল্লায় মারামারি, হিন্দু-মুসলমানে মারামারি নয়। নারায়ণের গদা আর আল্লার তলোয়ারে কোনো দিনই ঠোকাঠুকি বাঁধবে না, কারণ তাঁরা দুইজনেই এক, তাঁর এক হাতের অস্ত্র তাঁরই আর এক হাতের ওপর পড়বে না। তিনি সর্বনাম, সকল নাম গিয়ে মিশেছে ওঁর মধ্যে। এত মারামারির মধ্যে এইটুকুই ভরসার কথা যে, আল্লা ওর্ফে নারায়ণ হিন্দুও নন মুসলমানও নন। তাঁর টিকিও নেই, দাড়িও নেই। একেবারে "ক্লিন"। টিকি-দাড়ির ওপর আমার এত আক্রোশ এই জন্য যে, এরা সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষকে যে, তুই আলাদা আমি আলাদা। মানুষকে তার চিরন্তন রক্তের সম্পর্ক ভুলিয়ে দেয় এই বাইরের চিহ্নগুলো।

অবতার-পয়গম্বর কেউ বলেননি, আমি হিন্দুর জন্য এসেছি, আমি মুসলমানের জন্য এসেছি, আমি ক্রীশ্চানের জন্য এসেছি। তাঁরা বলেছেন, আমরা মানুষের জন্য এসেছি— আলোর মত, সকলের জন্য। কিন্তু কৃষ্ণের ভক্তেরা বললে, কৃষ্ণ হিন্দুর, মুহম্মদের ভক্তেরা বললে, মুহম্মদ মুসলমানদের, খ্রীস্টের শিষ্যেরা বললে, খ্রিস্ট ক্রীশ্চানদের। কৃষ্ণ- মুহম্মদ- খ্রিস্ট হয়ে উঠলেন জাতীয় সম্পত্তি! আর এই সম্পত্তিত্ব নিয়েই যত বিপত্তি। আলো নিয়ে কখনো ঝগড়া করে না মানুষে, কিন্তু গরু-ছাগল নিয়ে করে।'

(হিন্দু- মুসলমান/ রুদ্র-মঙ্গল)

'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে নজরুল লিখেছেন-

'আমার আবার ধর্ম কি? যার ঘরে বসে কথা কইবার অধিকার নেই, দুপুর রাতে দুঃস্বপ্নে যার ঘুম ভেঙ্গে যায়, অত্যাচারকে চোখ রাঙ্গাবার যার শক্তি নেই, তার আবার ধর্ম কি? যাকে নিজের ঘরে পরে এসে অবহেলায় পশুর মত মেরে ফেলতে পারে, যার ভাই-বোন বাপ-মাকে মেরে ফেললেও বাক্যস্ফুট করবার আশা নাই, তার আবার ধর্ম কি? দু'বেলা দুটি খাবার জন্যই যার বাঁচা, একটু আরাম করে কাল কাটিয়ে দেবার জন্যেই যার থাকা, তার আবার ধর্ম কি?'

নজরুল বুঝেছিলেন যে, মানুষের প্রধান ধর্মই হচ্ছে মানুষের যাবতীয় কল্যাণকে নিশ্চিত করা। জীবনের নিরাপত্তা অর্জন করা এবং মানুষের পূর্ণ সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকা।

তরুণদের উদ্দেশ্য করে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন-

'ওগো তরুণ, আজ কি তুমি ধর্ম নিয়ে পড়ে থাকবে— তুমি কি বাঁচবার কথা ভাববে না? ওরে অধীন, ওরে ভণ্ড তোর আবার ধর্ম কি?'

(আমার ধর্ম)

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম সম্পর্কে নজরুলের উদার মানসিকতার পরিচয় তাঁর অভিভাষণেও পাওয়া যায়। 'যৌবনের গান'- এ তিনি বললেন-

'পথ-পার্শ্বের ধর্ম- অট্টালিকা আজ পড় পড় হইয়াছে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেওয়াই আমাদের ধর্ম, ঐ জীর্ণ অট্টালিকা চাপা পড়িয়া বহু মানবের মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। যে ঘর আমাদের আশ্রয় দান করিয়াছে, তাহা যদি সংস্কারাতীত হইয়া আমাদেরই মাথায় পড়িবার উপক্রম করে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া নতুন করিয়া গড়িবার দুঃসাহস আছে একা তরুণেরই।'

নজরুল আন্তরিকভাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রদায়নিরপেক্ষ সম্প্রীতি প্রত্যাশা করেছেন যার প্রমাণ তাঁর চিঠিপত্রেও রয়েছে। আন্ওয়ার হোসেনকে লিখিত পত্র থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যায়:

'আমি মুসলমান- কিন্তু আমার কবিতা সকল দেশের, সকল কালের এবং সকল জাতির। কবিকে হিন্দু-কবি, মুসলমান-কবি ইত্যাদি বলে বিচার করতে গিয়েই এত ভুলের সৃষ্টি!'

চিঠির অন্যত্র লিখেছেনঃ

'ধর্মের বা শাস্ত্রের মাপকাঠি দিয়ে কবিতাকে মাপতে গেলে ভীষণ হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। ধর্মের কড়াকড়ির মধ্যে কবি বা কবিতা বাঁচেও না, জন্মও লাভ করতে পারে না।'

অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁকে লিখিত পত্রেও নজরুলের ধর্ম সম্পর্কে মানসিকতার পরিচয় প্রকাশিত।

'বাঙলা-সাহিত্য হিন্দু-মুসলমানের উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দু দেব-দেবীর নাম দেখলে মুসলমানের রাগ করা যেমন অন্যায় হিন্দুরও তেমনি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের মধ্যে নিত্য-প্রচলিত মুসলমানি শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভুরু কোঁচকানো অন্যায়। আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তাদের এ -সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানি শব্দ ব্যবহার করি, যা হিন্দু- দেব-দেবীর নাম নিই।'

প্রকৃতপক্ষে নিজ ধর্মের সারসত্য যথার্থভাবে অনুধাবন করতে পারলে; অপরাপর ধর্মের মূলসত্যের প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন সম্ভব। বলা বাহুল্য, নজরুলের পক্ষে তা সম্ভব হয়েছে। তিনি নিজেকে ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ঊর্দ্ধে রাখতে পেরেছেন ধর্মের মূল সত্যের সঙ্গে আত্মিক সংযোগের কারণে। কিন্তু পূর্ববর্তীগণ এই আত্মিক সংযোগের অভাব অথবা ব্যবধানের কারণেই পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক হতে পারেননি। পক্ষান্তরে উপমহাদেশের চরম সাম্প্রদায়িকতার মধ্যেও নজরুল অবিচলিত অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে বিপ্লবী কবি হিসেবে তাঁর বাণীসংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। কবি কালিদাস রায় যথার্থই বলেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

"কাজী তার কাব্য ও সঙ্গীতে হিন্দুর সংস্কৃতি ও মুসলমানের সংস্কৃতির অপূর্বব মিলন ঘটিয়েছে ছন্দে, ভাষায়, অলঙ্কারে এবং রসাদর্শে কেবল উভয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলেই এটা সম্ভব হয়না। কাজীর চেয়ে উভয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে হয়ত অনেকের ঢের বেশী জ্ঞান আছে কিন্তু উভয় সংস্কৃতির প্রতি এত দরদ, এত উদার সবর্ব- সংস্কারমুক্ত মন আর কার আছে? প্রকৃত কবির চিত্ত সবর্বসংস্কারমুক্ত। কাজী সে চিত্তের অধিকারী বলেই কাব্যের দরবারে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ঘটাতে পেরেছে।"[২]

তথ্যনির্দেশ

১। ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত, "নজরুল - চরিতমানস', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৯৭, পৃ: ৩৩।

২। আবুল ফজল, 'বিদ্রোহী কবি নজরুল', নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ, আগস্ট, ১৯৭১, পৃ: ১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

নারীর অধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

পৃথিবীতে নারীর অধিকার অস্বীকৃত দীর্ঘকাল ধরে। পুরুষ প্রধান সমাজে তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার দীর্ঘ দিন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই মানসিকতার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য সমাজে প্রথম নারীর অধিকারগত দিকটি ক্রমশ প্রাধান্য পেতে থাকে। সতেরো শতক থেকে পাশ্চাত্যে নারীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে দলিলাকারে প্রতিবাদ প্রকাশিত হতে শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ, ১৬৬২ সালে ওলন্দাজ মহিলা মার্গারেট লুকাস রচিত 'ফিমেল ওরেশনস্' (Female Orations), ব্রিটিশ লেখিকা মেরী অ্যাসটেল কর্তৃক ১৭০০ সালে প্রকাশিত 'রিফ্লেকশনস আপন ম্যারেজ (Reflections upon Marriage) গন্থের নাম স্মরণ করা যায়। ১৭৯২ সালে ইংল্যান্ডে প্রকাশিত মেরী উলস্টোনক্রাফট তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ 'Vindication for the Rights of Women' -এ নারীর অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে আরো গতিশীল করে তোলেন। এ সময় সচেতন মহলে নারীর প্রতি পুরুষ শাসিত সমাজের একচোখা আচরণের তীব্র বিরোধিতা ও সমালোচনা শুরু হয়। নারীর অধিকার বিষয়ে এ পর্যায়ের ব্যক্তিত্বদের মধ্যে শার্ল ফুরিয়ে, হ্যারিয়েট মার্টিনিয়্যু, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এবং জন স্টুয়ার্ট মিল অন্যতম। জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর বিখ্যাত 'The Subjection of Women' (১৮৬৯) গ্রন্থে উচ্চকণ্ঠে নারী- পুরুষের সমানাধিকারের দাবি উপস্থাপন করেন। এভাবে পাশ্চাত্যের চেতনা জগতকে নারীমুক্তি আন্দোলন প্রবলভাবে আলোড়িত করে। বলা প্রয়োজন, পাশ্চাত্যের চেতনা জগতকে সেসময় ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব এবং আঠারো শতকের ইউরোপীয় রেঁনেসা প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল।

পাশ্চাত্যের এসব ঘটনাবলীর প্রতিধ্বনি বহুকাল পরে শোনা যায় প্রাচ্য দেশে। প্রাচ্যের সচেতন মহল জাগ্রত হন নারীমুক্তির বাণীতে, বেদনাবিদ্ধ হন নারীর অসম্মানে। উনিশ শতকের প্রারম্ভে বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা- সভ্যতা- সংস্কৃতির প্রভাবে নারীমুক্তি আন্দোলন শুরু হয় এবং তার প্রবক্তা বলা যেতে পারে ব্রাহ্ম সমাজ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। রামমোহন রায় সর্বপ্রথম পরোক্ষভাবে ভারতীয় নারীদের ওপর অমানবিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। পরবর্তী সময়ে আইন পাশ করিয়ে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করণের মধ্য দিয়ে তিনি নারীর অধিকার আদায়ের আন্দোলনে কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায় তিনটি পদক্ষেপকে। তা হচ্ছে অবরোধ প্রথার বিলোপ সাধন, নারীকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা এবং নারীকে সর্বদিক থেকে পুরুষের সমমর্যাদাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

উনিশ শতকের অপর প্রবাদ পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ নিরোধ, বিধবা বিবাহ প্রচলন এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে নারীকে পূর্ণ সামাজিক মর্যাদায় আসীন করতে চেয়েছেন। নিশ্চিত করতে চেয়েছেন সমাজে নারী পুরুষের সমানাধিকার এবং সমমর্যাদাপূর্ণ সহাবস্থান। কিন্তু নারীমুক্তি আন্দোলন হিন্দুসমাজে যতটা গতিশীল হয়েছে মুসলমান সমাজে ততটা হয়নি। ঐতিহাসিক পটভূমিকাই এর অন্যতম প্রধান কারণ। বাঙালি মুসলমান সমাজে নারীর সমস্ত প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠে আবির্ভূত হন

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া। মুসলিম সমাজ মনের জড়তা, কুসংস্কার ও অবরোধের বিরুদ্ধে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। তাঁর রচিত 'সুলতানার স্বপ্ন' গ্রন্থে নারীর মুক্তি ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের চিত্রায়ণ করা হয়েছে। 'অবরোধবাসিনী'-তে মুসলমান নারীদের পর্দাপ্রথার নামে যে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয় তার বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলা সাহিত্যের শক্তিধর ব্যক্তিত্ব কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭০) তাঁর 'মেঘনাদবধ' ও 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে নারী চরিত্র অঙ্কন করেছেন ব্যক্তিত্ব আরোপ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) নারীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার প্রশ্নে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন। পরবর্তীতে নারী মুক্তির স্বপক্ষেই তিনি কাজ করে গেছেন।

সমসাময়িক সাহিত্যে নারী-পুরুষের সমানাধিকার ও সমমর্যাদা প্রদানের মানসিকতাকে প্রতিফলিত করার প্রয়াস যে ক'জনের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে শরৎচন্দ্র এবং নজরুল ইসলাম তাঁদের অন্যতম। স্বভাবগতভাবে নারীর প্রতি সুগভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাশীলতাই শরৎচন্দ্রকে নারী স্বাধীনতায় আস্থাবান করে তুলেছে যার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর সমগ্র কথাসাহিত্যে। শরৎচন্দ্র ও নজরুল দৃষ্টিভঙ্গিগত দিক থেকে নারীর প্রতি অভিন্ন মানসিকতাসম্পন্ন একথা অবশ্য প্রযোজ্য নয়।

নজরুল তাঁর সচেতন মন ও সমাজ অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করেছেন যে, নারী হচ্ছে পুরুষের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক যন্ত্র মাত্র। হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজেই নারীরা নির্মম নিষ্ঠুরতার, গঞ্জনার আর নির্যাতনের শিকার। নির্মম আর বিষময় অবরোধ প্রথার আওতাধীনে অন্দরে তাদের 'অন্ধকার-বাস'। বাইরের আলো-বাতাস তাদের জন্য যেন নিষিদ্ধ। নজরুল দেখতে পেয়েছেন নারী নিজ গৃহের এক কোণে বাস করেই জীবন অতিবাহিত করে দেয়। নারীর এই বন্দীদশা দেখে নজরুল বেদনাবিদ্ধ হন। সমাজে নারীর প্রয়োজনীয়তা কেবল পুরুষের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। অথচ জীবনে নানা আঘাত, বেদনা ও অবমাননা সহ্য করেও নারী অনুদার পুরুষ শাসিত সমাজের প্রতি উদার ও আন্তরিক।

কবি শাশ্বত বাণীর প্রবক্তা। জাতি, ধর্ম, স্থান, কাল পাত্রভেদে চির আবেদনশীল অমর অক্ষয় বাণী রচনা করাই তাঁর ব্রত। সমাজের যাবতীয় অসাম্যের বিরুদ্ধে , অনিয়মের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী থাকে সদা সচল। চির অকল্যাণের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে—চির কল্যাণের, ন্যায়ের অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকায় কবি থাকেন সদা জাগ্রত। কাজী নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রে একথা সর্বাংশে সত্য। সমাজে বৈষয়িক ও স্বার্থকেন্দ্রিক কার্যকলাপ এমন দৃঢ় আসন করে নিয়েছে যে, নারী জাতির প্রতি উদার দৃষ্টি দেবার প্রয়োজনীয়তা কেউ অনুভব করেননি। এই উক্তির ব্যতিক্রম সীমিত ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। পুরুষের চিত্তের ও কামনার ইন্ধনে আত্মাহুতিই নারীর একমাত্র কর্তব্য বিবেচনায় যে অমানুষিক অত্যাচার ও পীড়ন করা হয় সাম্যবাদী চেতনায় বিশ্বাসী নজরুল তা দেখে স্থির থাকতে পারেননি। তিনি সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করেছেন নারীত্বের মর্যাদা, নারীর সার্বভৌমত্ব।

সৃষ্টির ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য নর-নারী দু'টি অপরিহার্য মানবসত্তা। একা পুরুষের পক্ষে সৃষ্টির ধারাকে বহন করে নেয়া সম্ভব নয়। তাই স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন নারী। আর এই দু'য়ের মিলনে বিকশিত হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর সৃষ্টি। অথচ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নারীর ওপর চলেছে পুরুষের অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতন, নারীত্বের চরম অবমাননা।

কেবলমাত্র 'পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্য্যা'- ধারণার বশবর্তী সমাজ নারীকে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যটুকু সাধনের জন্য যতটুকু স্বাধীনতা দেয়া উচিৎ ঠিক ততটুকুই দিয়েছে। যুগান্তের এই নির্মম অবহেলার বিরুদ্ধে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রতিবাদ করেছেন। তাঁদের মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছে নারীকে যথোচিত মর্যাদা দানের মন্ত্রবাণী। নারীকে মাতৃত্বের সম্মান জানাতে এবং পুরুষের সমান সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু নারীর প্রাণে অনুপ্রেরণা দিয়ে, মুক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে নারীর অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়নি। নারীকে পূজনীয়া দেবীরূপে শ্রদ্ধার বেদীতে বসিয়ে সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। ফলে তাদের নারীমুক্তির স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি। সঙ্গতকারণেই অসূর্যস্পশ্যা নারী অন্ধকারের বাসিন্দা হয়েই রয়ে গেল। অন্তঃপুরের লোহার কপাট ভেঙ্গে বাইরে আসার সুযোগ পেল না।

কবি নজরুল তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করলেন সমাজের জড় মানসিকতার বিরুদ্ধে। উচ্চারণ করলেন মুক্তির বাণী। নজরুলের দৃষ্টিতে নারীর কল্যাণী ও মাতৃরূপ বিশেষভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিজীবনে তিনি মাতৃসমা বিরজাসুন্দরী দেবী, গিরিবালা দেবী, মিসেস এম. রহমান ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্ত্রী বাসন্তীদেবীর অকৃপণ স্নেহলাভ ও তাঁদের মধ্যে মাতৃরূপ অবলোকন করেছেন। এর ফলে নারীর মাতৃরূপ তাঁর নিকট উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়েছে এবং বারাঙ্গনার মধ্যেও তিনি মাতৃরূপের পরিচয় পেয়েছেন।

কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও-গায়ে?
হয়ত তোমার স্তন্য দিয়াছে সীতা-সম সতী মায়ে।
নাই হ'লে সতী তবু ত তোমরা মাতা-ভগিনীরই জাতি;
তোমাদের ছেলে আমাদেরই মত, তারা আমাদের জ্ঞাতি;

(বারাঙ্গনা/সাম্যবাদী)

নারীর অপরাধ নিন্দনীয় আর পুরুষের অপরাধ অনিন্দনীয়- সমাজের এই পক্ষপাতিত্ব ও অনুশাসনকে কবি গ্রহণ করতে পারেননি। তাই তিনি বিদ্রোহ করেছেন সমাজের অন্যায়, অবিবেচনার বিরুদ্ধে, পুরুষের নির্মমতার বিরুদ্ধে। তেজোদৃপ্ত ভাষায় তিনি ঘোষণা করেছেন এঁরা পতিতা নয়। এরা পতিতা হ'লে অহল্যা, কুন্তি, দ্রৌপদীও পতিতা, তাঁরাও অসতী। এঁদের সন্তান জারজ সন্তান বলে বিবেচিত হলে দ্রোণ, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন, কর্ণ, সত্যকামও জারজ। কবির ভাষায়-

অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ পুত্র হয়,
অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়!

(বারাঙ্গনা/ সাম্যবাদী)

Dhaka University Institutional Repository

কবি সত্যেন্দ্রনাথের 'মেথর' কবিতায়ও সমাজের পতিতাদের প্রতি সহানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। কবির ভাষায়-

কে বলে তোমারে, বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে;
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।

(মেথর/কুহু ও কেকা)

সত্যেন্দ্রনাথ এবং নজরুল পতিতাদেরকে তাঁদের কবিতায় তুলে আনলেও এক্ষেত্রে নজরুল সত্যেন্দ্রনাথের চেয়ে অধিক সোচ্চার।

নারীর মর্যাদা ও সামাজিক স্বীকৃতি আদায়ের ক্ষেত্রে অন্যতম উদ্দীপনামূলক কবিতা নজরুলের 'নারী' কবিতাটি। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার অগ্নিবাণী এ কবিতার ছত্রে ছত্রে জ্বলে উঠেছে। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ 'যাত্রী'তে এক জায়গায় লিখেছেন- "লাঙ্গলে বের হলো নজরুলের নারী' কবিতাটি, একদিনের মধ্যে লাঙ্গল সব বিক্রী হয়ে গেল, সেই সংখ্যাটা আমাদের আবার ছাপতে হলো। নজরুলের কবিতাই ছিল লাঙ্গলের প্রধান আকর্ষণ।" এ 'নারী' কবিতায় নজরুলের নারীমুক্তির অমর বাণী ঘোষিত হয়েছে। নজরুল-পূর্ববর্তী বাংলা কাব্যসাহিত্যে নারীকেন্দ্রিক যে সব কবিতা আছে তার সঙ্গে এই কবিতার মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। অক্ষয়কুমার বড়াল মূলতঃ পত্নীপ্রেমকেই অবলম্বন করে নারীকে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ সেন নারীকে ভোগের উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার নারীর সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু নজরুল প্রচলিত দৃষ্টিতে নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি। 'সাম্যবাদী', 'মানুষ', বারাঙ্গনা' প্রভৃতি কবিতায় মানুষের ব্যবধান দূর করার যে কথা উচ্চারিত হয়েছে, 'নারী' কবিতায়ও সেই একই বাণী উচ্চারিত। কবি 'বারাঙ্গনা' কবিতায় বারাঙ্গনাদের প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন, কারণ তারা মাতা ভগ্নীদের জাতি। তিনি পুরাণ ইতিহাস থেকে উদাহরণ উপস্থাপনের মাধ্যমে বারাঙ্গনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে সচেষ্ট হয়েছেন। 'বারাঙ্গনা' কবিতার পরবর্তী 'নারী' কবিতায় নারীজাতির প্রতি কবির শ্রদ্ধাবোধের মনোভাব প্রতিফলিত।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীকে পণ্যরূপে গণ্য করা হত; পুরুষের সঙ্গে নারীর সমঅধিকারের নীতি স্বীকৃত হয়নি। আধুনিক কালেও মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার মানদণ্ডে সমাজে নারীর স্থান ও ভূমিকা নির্ধারিত হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিঘাতে বাংলা সাহিত্যে মানবিকতা বোধের যে সম্প্রসারণ ঘটে তারই কাব্যিক প্রকাশ 'নারী' কবিতাটি। 'নারী' কবিতায় নজরুল নারীকে পুরুষের সমানাধিকার দানের যে প্রয়াস পেয়েছেন তা তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। এ কবিতায় নজরুল সামন্ততান্ত্রিক জীবনাদর্শ বিরোধী সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। নজরুলের যুগগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে এভাবে—

সাম্যের গান গাই-
আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।

(নারী/ সাম্যবাদী)

Dhaka University Institutional Repository

সাম্যবাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ বলেই কবি নজরুল ইসলামের জীবনদর্শনে নারী-পুরুষের কোনো ভেদাভেদ নেই। বিশ্বে আজ পর্যন্ত যা মহান সৃষ্টি ও কল্যাণ সাধিত হয়েছে সেখানে শুধু একা পুরুষের নয়, নারী-পুরুষ উভয়ের ভূমিকাই বর্তমান। নারী যে মানব সমাজের Part and parcel -একথাই ব্যক্ত করেছেন নজরুল-

বিশ্বের যা-কিছু মহান্ সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

(নারী/ সাম্যবাদী)

নারী আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সংসারকে সুন্দর ও মধুময় করে তোলে। নারীর সংস্পর্শে আনন্দহীন সংসার রূপান্তরিত হয় আনন্দধামে। বৈচিত্র্যহীন জীবনে আসে বৈচিত্র্য, জীবন হয়ে ওঠে অর্থবহ। পুরুষ আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর— নারী উদার। যাবতীয় লোভ-লালসার উর্ধ্বে থেকে সংসারে গঠনমূলক যাবতীয় কর্মকাণ্ডে নারী নিজেকে নিয়োজিত রাখে। সে শুধু সন্তান জন্মই দেয় না, নিঃস্বার্থভাবে সন্তানকে অন্তরের সবটুকু ভালবাসা দিয়ে লালন করে। সুন্দর সংসার গ'ড়ে তুলে বিশ্বসৃষ্টির ধারাকে অব্যাহত রাখে। নারী সংসারকে সচল রাখে। কেবল একতরফাভাবে কোন সৃষ্টিশীল কর্ম সার্থকতায় রূপ নিতে পারে না। কেবল পুরুষে সংসার শ্মশানে পরিণত হত, কিন্তু নারীর কোমল স্পর্শে সংসার স্বর্গলোকে রূপান্তরিত হয়েছে—

এ-বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ-রস -মধু - গন্ধ সুনির্মল।

(নারী/ সাম্যবাদী)

এ বিশ্বে যুগে যুগে বহু অমর কীর্তি স্থাপিত হয়েছে, বহু মহৎ কার্য সাধিত হয়েছে নারীর উৎসাহে, অনুপ্রেরণায়। নারীর সুবিবেচিত হস্তক্ষেপে সৃষ্টিশীল তথা গঠনমূলক কার্য ও কীর্তি সাধিত ও নির্মিত হয়েছে। প্রেমের এক উজ্জ্বল নিদর্শন শ্বেত পাথরে নির্মিত তাজমহলের সৌন্দর্যে আমরা মুগ্ধ হই, বিস্ময় বোধ করি। অথচ এই তাজমহল নির্মাণের পেছনেও অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে নারী। মমতাজের প্রতি শাহ্জাহানের ভালবাসাই তাঁকে তাজমহলের মত অমন মনোমুগ্ধকর, চিন্তা উদ্দীপক কীর্তি নির্মাণে প্রেরণা যুগিয়েছে।

তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ?
অন্তরে তার মোমতাজ নারী, বাহিরেতে শা-জাহান।

(নারী/ সাম্যবাদী)

পুরুষ-শাসিত সমাজে নারী অবহেলিত ও অস্বীকৃত। অথচ সমাজের ক্রিয়াকাণ্ড লক্ষ্য করলে দেখা যাবে,পুরুষ অপেক্ষা নারীর ক্রিয়াশীলতা সমাজ বিকাশের ধারায় কম নয়। নর-নারীর যৌথ প্রচেষ্টাতেই সমাজ সুখকর, সুন্দর হয়।

Dhaka University Institutional Repository

শস্যক্ষেত্র উর্বর হ'ল, পুরুষ চালাল হল,

নারী সেই মাঠে শস্য রোপিয়া করিল সুশ্যামল।

(নারী/ সাম্যবাদী)

নারী পুরুষের হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চার করে। শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির মূলেও নারী যুগে যুগে প্রেরণা দান করেছে। পেত্রার্কের লরা, দান্তের বিয়াত্রিচ, কীট্‌সের ফ্যানী, শেলীর এমিলিয়া, চণ্ডীদাসের রামী, রবীন্দ্রনাথের কাদম্বরী আর নজরুলের নার্গিস- এঁদের অনুপ্রেরণা থেকেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কর্ম সম্পাদিত ও রচিত হয়েছে। নার্গিসের না-পাওয়া বেদনা নজরুলকে অমর কবি করে তুলেছে। নার্গিসের কথা থেকেই তা বোঝা যাবে। প্রথম প্রেমের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নার্গিস বলেছেন: "প্রথম দেখার পর থেকে কখন কিভাবে দু'জন দু'জনকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম! নজরুল তো আমাকে নিয়ে দৌলতপুরেই অনেকগুলো কবিতা ও গান লিখেছিল। আমাকে একনজর না দেখলে ও মনমরা হয়ে যেত।"[১]

এই দৌলতপুরে প্রায় আড়াই মাস অবস্থানকালে (২৩ চৈত্র, ১৩২৭ হতে ৪ আষাঢ়, ১৩২৮) প্রেম-কাতর নজরুল নার্গিসকে নিয়ে একাধিক কবিতা ও গান লেখেন। 'ছায়ানট' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা যেমন, 'বেদনা-অভিমান', 'অ-বেলায়', 'হার-মানা-হার', 'অনাদৃতা', 'হারা-মণি', 'মানস-বধূ', 'বিদায়-বেলায়', 'পাপড়ি খোলা', 'বিধুরা পথিক-প্রিয়া' ইত্যাদি এ সময়ে রচিত। একদিকে অভিমান থেকে বিরহের অতল গভীর বেদনা, অন্যদিকে মিলনের সুনিবিড় আনন্দ— এই দু'-ই পুরুষের মনে প্রেরণা সঞ্চারক হিসেবে কাজ করে। দান্তে 'Divine Comedy' -র পরিকল্পনা করেন বিয়াত্রিচকে না পাওয়ার বেদনায় জর্জরিত হয়ে। ব্রাউনিং 'Last ride together'-এর মত এমন চমৎকার কবিতা লিখেছেন এলিজাবেথকে পাওয়ার আনন্দ থেকে। দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের অমর সাহিত্য- কীর্তিগুলোর সৃষ্টির পেছনেও নারীর ভূমিকা রয়েছে। নজরুলের কবিতায় একথারই সত্যতা প্রমাণিত হয়ঃ

নারীর বিরহে, নারীর মিলনে, নর পেল কবি- প্রাণ,

যত কথা তার হইল কবিতা, শব্দ হইল গান।

(নারী/ সাম্যবাদী)

যুগে যুগে পুরুষ বিজয়লক্ষী নারীর অনুপ্রেরণায় সঞ্জীবিত হয়েই রণক্ষেত্রে জয়লাভ করেছে। লব-কুশকে সীতাই পালন করেছে। যুগে যুগে নারীই মহামানবশক্তির জন্মদান করেছে। পুরুষের দীপ্ত নয়নে শান্তস্নিগ্ধতা আনয়ন করেছে নারী। শিশুকে দয়ামায়া-স্নেহে- প্রেমে যথার্থ করে তোলে নারী। কবির দৃষ্টিতে তাই নারী- পুরুষে কোনো পার্থক্য নেই। সমাজ-সভ্যতার সৃষ্টিতে উভয়ের ভূমিকা সমান। পুরুষের জীবনে নারী তার স্নেহ-প্রেম নিয়ে এক সঞ্জীবনী সুধা। তাই কবি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। সেজন্য যুগের দাবিও প্রকাশিত-

সে-যুগ হয়েছে বাসি,

যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না ক', নারীরা আছিল দাসী!

বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,

কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি'।

(নারী/ সাম্যবাদী)

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের কুসংস্কার, গোঁড়ামি, রক্ষণশীলতা, ধর্মান্ধতা, আচারসর্বস্বতা ও সঙ্কীর্ণতার বেড়াজালে বন্দী নারীকে শৃঙ্খল ভাঙ্গার জন্যে বিদ্রোহ ঘোষণার আহবান জানিয়ে কবি বলেন—

আপনারে আজ প্রকাশের তব নাই সেই ব্যাকুলতা,
আজ তুমি ভীরু আড়ালে থাকিয়া নেপথ্যে কও কথা!
চোখে চোখে আজ চাহিতে পার না; হাতে রুলি, পায়ে মল
মাথায় ঘোমটা, ছিঁড়ে ফেল নারী,ভেঙে ফেল ও শিকল!

(নারী/ সাম্যবাদী)

নারী জাতিকে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে আধুনিক যুগোপযোগী মর্যাদাসম্পন্ন জীবনের অংশীদারিত্ব প্রদানের প্রয়াসে সমাজ-সচেতন কবি নজরুল নারীর প্রতি সর্ব প্রকার অত্যাচার ও অবিচারের উচ্ছেদসাধনে সামাজিক-সাংস্কৃতিক যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। পর্দা- প্রথার অবরোধ ভেঙে নারীকে বন্দীজীবন শেষ করার আহবান জানিয়েছেন এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার ও সমমর্যাদা দাবি করেছেন। তাঁর বিশ্বাস-

সেদিন সুদূর নয়-
যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়!

(নারী/ সাম্যবাদী)

নারীর সমানাধিকার তথা সমমর্যাদা আদায়ের ক্ষেত্রে নজরুল ইসলামী জীবন- বিধানের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন। ইসলাম ধর্মের পবিত্র গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করে তিনি বলেন-

বলে না কোরান, বলে না হাদিস, ইসলামী ইতিহাস,
নারী নর-দাসী, বন্দিনী র'বে হেরেমেতে বারোমাস!
হাদিস কোরান ফেকা ল'য়ে যারা করিছে ব্যবসাদারী,
মানে না ক' তা'রা কোরানের বাণী— সমান নর ও নারী!

(মিসেস্ এম্. রহমান/ জিঞ্জীর)

নারী- পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসের ওপর ভিত্তি করেই পুরুষ তার বিজয় কেতন ওড়াতে সক্ষম হয়। পুরুষের সব কর্মকাণ্ডে নারী অনুপ্রেরণা যোগায়। নারীর গুরুত্ব অনুধাবন ব্যতিরেকে জাতির শৌর্য-বীর্য অক্ষুণ্ন রাখা অসম্ভব। কবি নারীকে 'অমৃতময়ী' এবং 'করুণাময়ের দান' বলে উল্লেখ করেছেন—

নারী অমৃতময়ী, নারী কৃপা- করুণাময়ের দান,
কল্যাণ কৃপা পায় না, যে করে নারীর অসম্মান!

(নারী/শেষ সওগাত)

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর নজরুল 'আমাদের নারী' গানে কতিপয় মুসলিম নারীর উদাহরণ উপস্থাপনার মাধ্যমেও নারী জাতির মর্যাদাপূর্ণ অতীতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন- সমাজের নারীদের চেতনায় উজ্জীবিত করার অভিপ্রায়ে। নারীদের যোগ্যতা প্রসঙ্গে উচ্চারণ করেন রিজিয়া, চাঁদ সুলতানা, জেবুন্নেসা, লায়লা, ওহাবী, সকিনা ও জাহানারার মত নারীদের নাম। এঁরা প্রত্যেকেই নারী সমাজের জন্য প্রেরণাদায়িনী ব্যক্তিত্ব। পরিশেষে-

লক্ষ খালিদা আসিবে, যদি এ নারীরা মুক্তি পায়॥

(আমাদের নারী/ কবিতা ও গান)

বলে কবি নারীদের সমানাধিকার ও সমমর্যাদা প্রাপ্তির আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নজরুল নারীকে দিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্ব।মাতৃত্বের দাবিতে বসিয়েছেন পূজার বেদী মূলে। নারীর প্রতি নজরুলের অকুণ্ঠ ভক্তি, বিশ্বাস ও দরদবোধের নিদর্শন রয়েছে তাঁর কথা সাহিত্যে ।

'বাঁধনহারা' উপন্যাসে সোফিয়াকে লেখা মাহ্‌বুবার পত্রে নারীর প্রতি অবহেলা , অশ্রদ্ধা আর উৎপীড়নের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। পত্র থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যায়-

'খোদা আমাদের মেয়ে জাতটাকে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতেই পাঠিয়েছেন, আমাদের হাত-পা যেন পিঠমোড়া করে' বাঁধা, নিজে কিছু বলবার বা কইবার হুকুম নেই। খোদা-না-খাস্তা একটু ঠোঁট নড়লেই মহাভারত অশুদ্ধ আর কি! কাজেই, আছে আমাদের শুধু অদৃষ্টবাদ, সব দোষ চাপাই নন্দ-ঘোষস্বরূপ অদৃষ্টেরই ওপর! সেই মান্ধাতার আমলের পুরানো মামুলি কথা, কিন্তু অদৃষ্ট বেচারা নিজেই আজ তক অ-দৃষ্ট! ... আমাদের কর্ণধার মর্দরা কর্ণ ধরে যা করান তাই করি, যা বলান তাই বলি! আমাদের নিজের ইচ্ছায় করবার বা ভাববার মত কিছুই যেন পয়দা হয় নি দুনিয়ায় এখনো,— কারণ আমরা যে খালি রক্ত-মাংসের পিণ্ড। ভাত রেঁধে, ছেলে মানুষ করে আর পুরুষ দেবতাদের শ্রীচরণ সেবা করেই আমাদের কর্তব্যের দৌড় খতম।'

অন্যত্র:

'— পুরুষরাই ত আমাদের মধ্যে এইসব সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামি ঢুকিয়ে দিয়েচেন। এমন কেউ নেই আমাদের ভেতর যিনি এইসব পুরুষদের বুঝিয়ে দেবেন যে, আমরা অসূর্যম্পশ্যা বা হেরেম-জেলের বন্দিনী হলেও নিতান্ত চোর-দায়ে ধরা পড়ি নি। অন্তত পর্দার ভিতরেও একটু নড়ে চড়ে বেড়াবার দখল হতে খারিজ হয়ে যাই নি। আমাদেরও শরীর রক্ত-মাংসে গড়া; আমাদের অনুভব শক্তি, প্রাণ, আত্মা সব আছে। আর তা বিলকুল ভোঁতা হয়ে যায় নি। আজকাল অনেক যুবকই নাকি উচ্চশিক্ষা পাচ্চেন, কিন্তু আমি একে উচ্চ শিক্ষা না বলে লেখাপড়া শিখচেন বলাই বেশি সঙ্গত মনে করি। কেননা, এঁরা যত শিক্ষিত হচ্ছেন, ততই যেন আমাদের দিকে অবজ্ঞার হেকারতের দৃষ্টিতে দেখচেন, আমাদের মেয়ে জাতের ওপর দিন দিন তাঁদের রোখ চড়ে যাচ্চে। তাঁরা মহিষের মত গোঙানি আরম্ভ করে দিলেও কোন কসুর হয় না, কিন্তু দৈবাৎ যদি আমাদের আওয়াজটা একটু বেমোলায়েম হয়ে অন্তঃপুরের প্রাচীর ডিঙিয়ে পড়ে, তাহলে তারা প্রচণ্ড হুঙ্কারে আমাদের

Dhaka University Institutional Repository

চৌদ্দ পুরুষের উদ্ধার করেন। ওঁদের যে সাত খুন মাফ! হায়! কে বলে দেবে এদের যে, আমাদেরও স্বাধীনভাবে দুটো কথা বলবার ইচ্ছে হয় আর অধিকারও আছে, আমরাও ভালমন্দ বিচার করতে পারি।'

উপর্যুক্ত উদ্ধারাংশদ্বয় পাঠ করে একথা সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, নজরুল তাঁর সৃষ্ট চরিত্র মাহবুবার কথার ভেতর দিয়ে আসলে নিজের হৃদয়ের বক্তব্যকেই তুলে ধরেছেন।

নারীর নারীত্বকে নজরুল স্বাভাবিক মর্যাদা দিয়েছেন। তাই 'বাঁধনহারা' উপন্যাসে রাবেয়াকে লেখা সাহসিকার পত্রে সাহসিকাকে দিয়ে বলিয়েছেন-

'এই কল্যাণী নারীই বিশ্বের প্রাণ! এ - 'নারী' হিম হয়ে গেলে বিশ্ব- প্রাণের স্পন্দনও এক মুহূর্তে থেমে যাবে!' এ সহজ কথাগুলো ঔপন্যাসিক নজরুলের অন্তর- উৎসারিত উচ্চারণ।

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে রুবির যন্ত্রণাকাতর জীবনের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এসেছে নারীর অধিকার বোধের বিষয়টি। লতিফার বাড়ীতে অতীত জীবনের প্রাপ্তি- অপ্রাপ্তির হিসেব কষতে কষতে রুবি যখন বলে-

"আমার হৃদয়-মনকে উপবাসী রেখে অন্যের সুখের বলি হতে না পারাটাই বুঝি খুব বড় অন্যায় হয় তোদের কাছে বুঁচি? হয়ত তোদের কাছে হয়, আমার কাছে হয় না। আমার ন্যায় অন্যায় আমার কাছে। অন্যকে খুশী করতে গিয়ে সব কিছু উপদ্রব নীরবে সইতে পারাটাই কিছু মহত্ত্ব নয়। আমার বাপ-মার স্নেহ-ভালোবাসার ঋণ শোধ করতে গিয়েই ত আমি আজ এমন দেউলিয়া! আমার সুখ -স্বাচ্ছন্দ্য জীবনের আনন্দের পথ বেছে নেবার আমারই কোনো অধিকার থাকবে না?"

তখন সুদূর অতীতকাল থেকে চলে আসা নারীর প্রতি অবহেলার বাস্তব চিত্র ভেসে ওঠে। রুবির ওপর চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্তই তার জীবনের স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করেছে। আনন্দহীন হয়ে গেছে তার জীবন। নারীর প্রতি এই যে একচোখা নীতি আমাদের সমাজে যুগ যুগ ধরে বিদ্যমান তারই বিপক্ষে নজরুল শক্ত অবস্থান নিয়েছেন। রুবির কথার ভেতর দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। নারীর মুক্তির বার্তা ঘোষণা করেছেন অনাগতকালের মানুষের উদ্দেশ্যে।

'কুহেলিকা' উপন্যাসেও নজরুলের নারী বিষয়ক চিন্তার প্রকাশ স্পষ্ট। এ উপন্যাসের অন্যতম নারী চরিত্র 'শুক্লাচতুর্দ্দশীর চাঁদ' বিপ্লবী চম্পা। এ চম্পা ইংরেজ বিরোধী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত। দেশের মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী নারীদের প্রতিভূ সে। সে যে মন্ত্রে দীক্ষিত 'তাতে কেউ পুরুষ-নারী বলে নেই। সেখানে সকলে অগ্নি- সখা।' চম্পার জড়তাহীন সুস্পষ্ট উচ্চারণে নারীত্ব সম্পর্কে সচেতনতার প্রকাশ লক্ষ্যযোগ্য—"আমিও ত রক্তমাংশের মানুষ—আর তোমাদেরই মত পশুত্ব দিয়ে পশুকে জয় করার সাধনা আমার। লোভ তৃষ্ণা তোমাদের কারুর চেয়ে আমার কম নেই।"

চম্পা নারী হলেও পশুকে বিনাশের সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছে। পশুকে অর্থাৎ অমঙ্গলকে ধ্বংস করে মঙ্গল ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে। পুরুষের পাশাপাশি অংশ গ্রহণ করেছে রাজনৈতিক তথা সামাজিক মুক্তির সংগ্রামে। এখানে সে মানুষ। মানবিকতাবোধই তাকে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার মূল ধারার সাথে (যে ধারা কেবল পুরুষ কর্তৃক পরিচালিত) সম্পৃক্ত হবার প্রেরণা দিয়েছে। এখানে

Dhaka University Institutional Repository

নারীকে সমাজের আলাদা অংশ হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। নারীকে দেখা হয়েছে পুরুষের সহযোগী শক্তি হিসেবে। প্রকৃতপক্ষে নজরুল নারীকে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর অপরিহার্য অংশ হিসেবে দেখেছেন। তিনি নারী-পুরুষকে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীতে একই মুদ্রার এপিঠ- ওপিঠ হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

নারীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা ও সমানাধিকার প্রদানের পক্ষে নজরুলের বিবেকী মনোভাবের প্রকাশ তাঁর গল্পগুলোতেও লক্ষ্য করা যায়। নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'ব্যথার দান' (১৯২২) -এ 'ব্যথার দান' গল্পের একমাত্র নারী চরিত্র বেদৌরা প্রেমিক দারার যুদ্ধকালীন অনুপস্থিতিতে সয়ফুল্-মুল্ক নামক এক তরুণের প্রলোভনে পড়ে ভুলবশত বিপথগামিনী, জৈবিক তাড়নায় পদস্খলিতা। কিন্তু তথাপি বেদৌরা দারার কাছে ক্ষমাসুন্দর আচরণ লাভে সক্ষম হয়। দারার কাছ থেকে বেদৌরা লাভ করে বিরহসিক্ত মানসিক মিলনের অঙ্গীকার। সবচেয়ে লক্ষ্যযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে গল্পের সর্বত্র বেদৌরার মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে নজরুল তৎকালীন সময়ের বিবেচনায় অভিনব, উদার ও সংস্কারমুক্ত মানসিকতার পরিচয় দিয়ে নারী সম্পর্কে ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বেদৌরার স্মরণকৃত দারার বক্তব্যকে তুলে ধরা যায়-

"কামনায় হয়তো তোমার বাহিরটা নষ্ট ক'রেছে, কিন্তু ভিতরটা তো নষ্ট ক'রতে পারে নি।"

এ বক্তব্য শুধু দারার বক্তব্য নয়, এ বক্তব্যের ভেতর দিয়ে নজরুলের নারী সম্পর্কে মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। এখানে নজরুল নারীকে যথার্থ মর্যাদা দিয়ে সমাজে সম্মানজনক অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

'সমাজে নারী তার উপযুক্ত মর্যাদা অর্জন করুক'— এ ছিল নজরুলের হৃদয়ের কথা। নির্ভীক দৃঢ়তায় তিনি নারীর মুক্তির কথা বলেছেন। নারীর মুক্তি কামনার সাক্ষ্যবহ পরবর্তী গল্প 'অতৃপ্ত কামনা'। এ গল্পে স্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে বাল্যপ্রেম ও প্রেমের বিচ্ছেদ কাহিনী চিত্রিত করা হয়েছে। ছেলেবেলায় বাল্যসখী মোতির সাথে গল্পের নায়কের হাসি খেলা আর মারামারি করে দিন অতিবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু মোতি

'... যখন এগারোর কাছাকাছি, তখন তাকে জোর করে অন্দর- মহলের আঁধার কোণে ঠেসে দেওয়া হ'ল।' মুক্ত জীবনকে করা হল অবরুদ্ধ। মুক্ত জীবনে অভ্যস্ত মোতি যখন মুক্তি আর বন্ধনের যুঝাযুঝির মাঝে প'ড়ে কাহিল হ'য়ে উঠল তখন সমাজ তার প্রতি কঠোর ভাষায় উচ্চারণ করলে, '... —রাখ্ তোর এ - মুক্তি— আমি এই দেওয়াল দিলাম।

সেই দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে রক্ত -গঙ্গা বহালে, পাষাণের দেওয়াল— ভাঙতে পারলে না!'

এখানে নজরুল প্রাচীরঘেরা, অন্তঃপুরের অবরোধবাসিনী মোতির জীবন চিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে সমকালীন নারী সমাজের অসহনীয় অবস্থার বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। সমাজে নারীর জীবনযাপন যে সম্পূর্ণতই ছিল আরোপিত সেই বাস্তব দিক উপস্থাপিত। গল্পে নায়ক নায়িকার পরিণতিহীন প্রেমের বিচ্ছেদ-বেদনা মুখ্য হয়ে উঠলেও কাহিনীর পারম্পর্য বর্ণনায় নারীর প্রতি সমাজের এ হৃদয়হীন বাস্তবতা থেকে নারীজাতির সার্বিক অবস্থার প্রকৃত চিত্র উপলব্ধ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কাজী নজরুল ইসলামের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'রিক্তের বেদন'। এ গ্রন্থের 'মেহের-নেগার' গল্পেও নজরুল নারীর দুঃখময় পরিণতির চিত্রাঙ্কন করেছেন। এ গল্পের প্রধান চরিত্র গুলশন্, বাইজীর মেয়ে- রূপজীবিনীর কন্যা হওয়ায় হীনমন্যতায় ভোগে। নিজেকে সে ঘৃণ্য, অপবিত্র মনে করে। জীবনযন্ত্রণা সহ্য করে বেড়ে ওঠে সে। তার এ দুঃখময় অনুভূতিই তাকে প্রেমিকের অকৃত্রিম ভালবাসা গ্রহণ থেকে বিরত রাখে। যেকারণে নিজের হৃদয়ে আলোড়িত স্বপ্নময় প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে চাপা দিয়ে ভোগে নয়, ত্যাগেই প্রেমের সার্থকতা পেতে চায়। সঙ্গতকারণেই ভালো-লাগা পুরুষের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে এবং সে আশ্রয় নেয় মৃত্যুর শীতল কোলে। আর তার সমাধির শিয়রে উৎকীর্ণ থাকে আত্মবিশ্বাসী অথচ বেদনাময় অনুরোধ-

'অপবিত্র জঠরে জন্ম নিলেও ওগো পথিক, আমায় ঘৃণা করো না! একবিন্দু অশ্রু ফেলো, আমার কল্যাণ কামনা ক'রে —আমি অপবিত্র কি-না জানি না, কিন্তু পবিত্র ভালোবাসা আমার এই বুকে তার পরশ দিয়েছিল।'

গুলশন্-এর এ করুণ পরিণতির জন্য তার দ্বিধাগ্রস্থ মন দায়ী। তার সমাজ ও সমাজের সংকীর্ণ অনুদার মনোভাবই তার মনকে দ্বিধান্বিত করেছে। সমাজশক্তির একপেশে মনোভাবই গুলশন্ বা মেহের-নেগারের করুণ মৃত্যু ঘটিয়েছে।

নারীজাতি কতটা অসহায় তার সুস্পষ্ট ও চিত্রবৎ বর্ণনা নজরুল 'মেহের-নেগার' গল্পে দিয়েছেন। সংবেদনশীল দৃষ্টি দিয়ে তিনি নারীজাতির বেদনাকে উন্মোচন করেছেন। তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত জীবন থেকে কাঙ্ক্ষিত জীবনে উত্তরণ ঘটুক মনেপ্রাণে এ কামনা করেছেন।

'রাক্ষুসী' গল্পেও নারী পুরুষের সমতায়নের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করা হয়েছে। অন্দরে আটক নারীদের দুর্গতির অবসান কামনা থেকেই 'রাক্ষুসী' গল্পের সৃষ্টি। স্বামীহন্তা বাগ্‌দী রমণী বিন্দির আত্মকাহিনীই হচ্ছে 'রাক্ষুসী' গল্প। পরনারীতে আসক্ত স্বামীকে বিন্দি নিজ হাতে হত্যা করেছে। বিন্দির ধারণা স্বামীকে সে অপরাধ করতে না দিয়ে নরক যাত্রা থেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু সামাজিক আইনে অপরাধী বিন্দি জেল খেটেছে। জেল থেকে মুক্তি লাভের পরও সমাজ তাকে রেহাই দেয়নি। ঘৃণা, অবজ্ঞা, অপমান আর নির্যাতনে জর্জরিত করেছে।

যে বিন্দি একদিন ছিল স্বামীর একান্ত অনুগত সেই বিন্দিই স্বামীকে জীবনের সঠিক পথে ফেরাতে ব্যর্থ হয়ে তাকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। জীবনের রূঢ় বাস্তবতা থেকে সে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অসংগতিগুলো সম্পর্কে অবহিত হয়েছে। তাই দৃঢ়ভাবে সে বলতে পেরেছে —

"... আমি ন্যায় ছাড়া অন্যায় কিছু করি নাই। ... পুরুষেরা ওতে যাই বলুক, ... আর পুরুষেরা ও-রকম চেঁচাবেই,- কারণ তারা দেখে আস্‌ছে যে, সেই মান্ধাতার আমল থেকে শুধু মেয়েরাই কাটা পড়েছে তাদের দোষের জন্যে। মেয়েরা পেথম্ পেথম্ এই পুরুষদের মতই চেঁচিয়ে উঠেছিল কি না এই অবিচারে, তা আমি জানি না। তবে ক্রমে তাদের ধা'তে যে এ খুবই সয়ে গিয়েছে এ নিশ্চয়। আমি যদি ঐ রকম একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসতুম আর যদি আমার সোয়ামি ঐ জন্যে আমাকে কেটে ফেল্‌ত, তাহ'লে পুরুষেরা একটি কথাও বল্‌ত না। তাদের সঙ্গে মেয়েরাও বল্‌ত, 'হাঁ, ও রকম খারাপ মেয়েমানুষের ঐ রকমেই মরা উচিত।' কারণ তারাও বরাবর দেখে আস্‌ছে, পুরুষদের সাত খুন মাফ।"

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর মর্যাদাহীন অবস্থার প্রতি বিন্দি ইঙ্গিত করেছে। বিন্দিকে নজরুল পুরুষের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবে চিত্রিত করেছেন। 'রাক্ষুসী' গল্পের মাধ্যমে নজরুল সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে তাঁর ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

'রিক্তের বেদন' গ্রন্থের 'স্বামীহারা' গল্পেও বিধবা নারীর সামাজিক অবস্থানকে তুলে ধরা হয়েছে। বিধবা নারী সমাজে কতটা অবহেলা আর যন্ত্রণাকাতর জীবন অতিবাহিত করে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন এই গল্পে।

দরিদ্র বেগমের বিয়ে হয় অভিজাত বংশে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর সে গ্রামবাসীর বিভিন্ন যন্ত্রণাদায়ক আচরণের শিকার হয়। গ্রামের মানুষ তার জীবনটাকে দুর্বিষহ করে তোলে। বেগমের যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার মর্মস্পর্শী স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে-

"খোদা যেন মেয়েদের বিধবা কর্‌বার আগে মরণ দেন, তা না হলে তাদের বে' হবার আগেই যেন তারা 'গোরে' যায়। তোর যদি মেয়ে হয় সলিমা, তা'হলে তখ্‌নি আঁতুড় ঘরেই নুন খাইয়ে মেরে দিস্, বুঝলি? নৈলে চিরটা কাল আগুনের খাপ্‌রা বুকে নিয়ে কাল কাটাতে হবে।"

বিধবা নারীর জীবন সমাজে কতটা বিষময় তার পরিচয় বেগম সম্পূর্ণভাবেই পেয়েছে। তাই নারীজাতিকে সে অকপটে 'মন্দভাগিনী স্ত্রী জাতি' বলে অভিহিত করতে পেরেছে।

নজরুল 'স্বামীহারা' গল্পে নারীর প্রকৃত অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং একই সাথে নারীজাতির জাগরণও কামনা করেছেন।

নজরুল তাঁর কয়েকটি অভিভাষণেও নারীর মুক্তির কথা বলেছেন। নারীদেরকে জীবনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে স্বাধীনভাবে বিচরণের অধিকার প্রদানের পক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন। ১৯৩২ সালে বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের সভাপতি রূপে 'তরুণের সাধনা' শীর্ষক অভিভাষণে দেশের অবরোধ প্রথার কুফল সম্পর্কে তিনি বলেন,

'আলো বায়ুর অভাবে বাঙালী মুসলমানের বাড়িতে শতকরা আশিজন মেয়ে যক্ষায় ভুগিয়া মরিতেছে। এই সব যক্ষারোগগ্রস্ত জননীর পেটে স্বাস্থ্য সুন্দর প্রতিভা-দীপ্ত বীর সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবে কেমন করিয়া, ফাঁসির কয়েদিরও এইসব হতভাগিনীদের অপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা আছে।'

'কন্যাকে পুত্রের মতই শিক্ষা দেওয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ, তাহা মনেও করিতে পারি না। আমাদের কন্যা- জায়া-জননীদের শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, অশিক্ষার গভীরতর কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চিরবন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের শত শত বর্ষের এই অত্যাচারে ইহাদের দেহ-মন এমনি পঙ্গু হইয়া গিয়াছে যে, ছাড়িয়া দিলে ইহারাই সর্বপ্রথম বাহিরে আসিতে আপত্তি করিবে। ইহাদের কি দুঃখ কিসের যে অভাব তাহা চিন্তা করিবার শক্তি পর্যন্ত ইহাদের উঠিয়া গিয়াছে।'

নারীজাতির দুর্দশার চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন- 'এখন আমাদের তরুণদের সাধনা হউক আমাদের এই চির-বন্দিনী মাতা-ভগ্নিদের উদ্ধার সাধন। ... এই পিঞ্জরের পাখির দ্বার মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। খোদার দান এই আলো-বাতাস হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই! খোদার রাজ্যে পুরুষ

Dhaka University Institutional Repository

আজ জালিম, নারী আজ মজলুম। ইহাদেরই ফরিয়াদে আমাদের এই দুর্দশা, আমাদের মত হীনবীর্য সন্তানের জন্ম।"

১৯২৯ সালে চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে প্রদত্ত 'মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা' শীর্ষক অভিভাষণে কাজী নজরুল ইসলাম চট্টগ্রামের কীর্তিমান পুরুষ বেগম শামসুন নাহার মাহমুদের মাতামহ খান বাহাদুর আবদুল আজিজ সাহেবকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। নারী জাগরণ প্রত্যাশী এ মহান পুরুষকে স্মরণের মধ্য দিয়ে নজরুল মূলতঃ নারী জাগরণের প্রতি তাঁর সমর্থনকেই পুনর্ব্যক্ত করলেন। তিনি বলেন-

"তাঁকে দেখিনি কিন্তু তাঁকে অনুভব করেছি এবং আজও করছি আপনাদের জাগরণের মাঝে— আমাদের নারী- জাগরণের উদয়-বেলায়। ... তাঁর কাজ তিনি করে গেছেন। ... তাঁর 'নাহারের মত নাহার আপনাদের চট্টলের মুসলমানের ঘরে কয়টি আছে আমার জানা নেই।"

'বাঙলার মুসলিমকে বাঁচাও' শীর্ষক অভিভাষণেও নজরুলের নারী সম্পর্কে ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। ১৩৪৩ (বাংলা) সালে ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র-সম্মিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে তিনি তরুণ ছাত্রদলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "সমাজের স্তরে স্তরে, তার গোপনতম কোণে কোণে, বোরকার অন্তরালে, আবরুর মিথ্যা আবরণে যে আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে, তার নিরাকরণ করো।

ইসলামের প্রথম ঊষার ক্ষণে, সুবহ্ সাদেকের কালে যে কল্যাণী নারীশক্তি রূপে আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করে আমাদের শুধু সহধর্মিনী নয়, সহকর্মিনী হয়েছিলেন- যে নারী সর্বপ্রথম স্বীকার করলেন আল্লাহ্কে, তাঁর রসুলকে-তাঁকেই আমরা রেখেছি দুঃখের দূরতম দুর্গে বন্দিনী করে— সকল আনন্দের, সকল খুশির হিস্সায় মহরুম করে। তাই আমাদের সকল শুভ-কাজ, কল্যাণ উৎসব আজ শ্রীহীন, রূপহীন, প্রাণহীন। তোমরা অনাগত যুগের মশাল বর্দার— তোমাদের অর্ধেক আসন ছেড়ে দাও কল্যাণী নারীকে। দূর করে দাও তাঁদের সামনের ঐ অসুন্দর চটের পর্দা যে পর্দার কুশ্রীতা ইসলাম- জগতের, মুসলিম জাহানের আর কোথাও নেই। দেখবে তোমাদের কর্তব্যের কঠোরতা, জীবন পথের দুরধিগম্যতা হয়ে উঠবে সুন্দরের স্পর্শে পুষ্প-পেলব। কর্মে পাবে প্রেরণা, মনে পাবে সুন্দরের স্পর্শ, কল্যাণের ইঙ্গিত। সম্মান দেওয়ার নামে এতদিন আমরা আমাদের মাতা-ভগিনী-কন্যা-জায়াদের যে অপমান করেছি আজও তার প্রায়শ্চিত্ত যদি না করি তবে কোন জন্মেও এ জাতির মুক্তি হবে না।"

কেবল অভিভাষণেই নয়, ব্যক্তিগত চিঠিপত্রেও নজরুল নারীদের সম্পর্কে তাঁর শুভেচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। ১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগর থেকে শামসুন নাহার মাহমুদকে লিখিত এক পত্রে নারীদের সম্পর্কে নজরুলের বক্তব্য ছিল- "আমাদের দেশের মেয়েরা বড় হতভাগিনী। কত মেয়েকে দেখলাম কত প্রতিভা নিয়ে জন্মাতে, কিন্তু সব সম্ভাবনা তাদের শুকিয়ে গেল সমাজের প্রয়োজনের দাবীতে। ঘরের প্রয়োজন তাদের বন্দিনী করে রেখেছে। এত বিপুল বাহির যাদের চায়,তাদের ঘিরে রেখেছে বারো হাত লম্বা আটহাত চওড়া দেওয়াল। বাহিরের আঘাত এ দেওয়ালে বার বার প্রতিহত হয়ে ফিরল। এর বুঝি ভাঙ্গন নেই, অন্তর হতে মার না খেলে। তাই নারীদের বিদ্রোহিনী হতে বলি। তারা ভেতর হতে দ্বার চেপে ধরে বলছে আমরা বন্দিনী। দ্বার খোলার দুঃসাহসিকা আজ কোথায়? তাকেই চাইছেন যুগদেবতা।'

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, নারী স্বাধীনতার পক্ষে সোচ্চার, প্রতিবাদী চেতনায় মুখর নজরুল নারীকে তার পূর্ণ মানবিক মর্যাদায় রূপায়ণের প্রয়াস পেয়েছেন তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি থেকে। তদুপরি উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রেরণাও তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল। নারীকে তিনি উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন আত্মপ্রত্যয় ও মুক্তির চেতনায়। নজরুল প্রত্যক্ষ করেছেন সমাজে মানব কন্যার নিচে আর কোন মানব পুত্র নেই। তাই সমাজের এই 'পশ্চাদপদ অংশ'কে নিয়ে তিনি চিন্তা করেছেন। নারীকে তিনি জাগাতে চেয়েছেন সর্ব প্রকার অধীনতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, অন্যায় ও অমর্যাদার বিরুদ্ধে।

তথ্যনির্দেশ

১। মোবাশ্বের আলী, 'নার্গিসঃ নজরুল সাহিত্যে', দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ মে ২০০০, পৃ: ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

কাজী নজরুল ইসলাম ধনী অভিজাত পরিবারের সন্তান নন, সোনার চামচ মুখে নিয়ে তাঁর জন্ম হয়নি। আজীবন দুঃখের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা ছিল।তাই শোষিত মানবতার ত্রাণের জন্য তিনি কেবল বিদ্রোহের বাণী শোনাননি, সেই বিদ্রোহের বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। সর্বহারাদের একজন হওয়ায় বঞ্চিত, শোষিত মানুষের দুর্দশাকে তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। নজরুলের কাম্য ছিল শ্রেণীহীন সর্বশোষণমুক্ত একটা সমাজ ব্যবস্থা। কারণ, সমাজের শুভ ও কল্যাণের জন্য প্রয়োজন শোষণহীন সমাজ। মূলতঃ অত্যাচারিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত, নির্জীব ও সন্ত্রাসী সমাজ-ব্যবস্থার উচ্ছেদেই জনকল্যাণ নিহিত। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের সমাজের সর্বত্র বৈষম্য, বঞ্চনা আর মানুষের অধিকার হরণের চিত্র প্রত্যক্ষ করে নজরুল ব্যথিত হয়েছেন। তাই তিনি বিপ্লবের কথা বলেছেন, সর্বপ্রকার শোষণ ও শাসনের অবসান ঘটাতে চেয়েছেন এবং এজন্যে মানুষের মধ্যে মানবতাবোধ জাগাতে চেয়েছেন। মানুষকে 'উন্নত শির' হয়ে বিরাজ করতে বলেছেন —

বল বীর—
বল উন্নত মম শির!

(বিদ্রোহী/ অগ্নি-বীণা)

অতঃপর উৎপীড়িত জনগণের পক্ষাবলম্বন করে অন্যায়, অত্যাচারের অবসান ঘটাতে লৌহদৃঢ় শপথ গ্রহণ করেছেন। সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন তাঁর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড সেদিনই বন্ধ হবে —

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে -বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না —
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

(বিদ্রোহী/অগ্নি-বীণা)

নজরুলের যুগ জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগ হওয়ায় স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা সে যুগের মানুষকে আলোড়িত করেছিল। কিন্তু সেই চেতনার গভীরে সর্বব্যাপক সামাজিক মুক্তি তথা সমাজ-বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষাও নিহিত ছিল। শোষিত, নির্যাতিত শ্রেণীর মুক্তির সনদ রচনা করে তিনি এদেশের মানুষকে নতুন পথের সন্ধান দিলেন। এই পথ নির্দেশের জন্য তিনি যে শিখা জ্বালিয়েছিলেন- তার নাম 'লাঙল'। এটি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রধান পরিচালক ছিলেন নজরুল ইসলাম। শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়ের মুখপত্র এ পত্রিকার প্রথম খণ্ড-বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে। এ পত্রিকায়ই নজরুলের মতবাদ তথা গণতান্ত্রিক সমাজবাদ সর্বসমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয় নজরুলের বিখ্যাত সাম্যবাদী' কবিতা। এই সংখ্যার প্রচ্ছদে ধনিকের হাতে শ্রমিক নির্যাতিত হবার চিত্রের নীচে লেখা ছিল-

পেট-পোরা তার রাক্ষুসী ক্ষুধা
ধনিক সে নির্মম,
দীনের রক্ত নিঙাড়িয়া করে
উদর-ভূধর-সম।

'লাঙলে'র প্রথম সংখ্যায় নজরুল লিখিত সম্পাদকীয় থেকে একটি অংশ নিচে উদ্ধৃত হল —

"যেখানে দিন দুপুরে ফেরিওয়ালী মাথায় করে মাটি বিক্রি করে সেই আজব শহর কলকাতায় 'লাঙল' চালাইবার দুঃসাহস যারা করে তাদের সকলেই নিশ্চত পাগল মনে করেছেন। কিন্তু এই পাষাণ শহরেই আমরা 'লাঙল' নিয়ে বেরুলাম।এই পাষাণের বুক চিরে আমরা সোনা ফলাইতে চাই।

... ...

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রয়োজনে শহরের সৃষ্টি হয়ে পল্লীমুখী বাংলার সভ্যতা ও সাধনা লোপ পেতে বসেছে। শাসন ও শোষণের সহায়তায় যন্ত্র স্বরূপে ভদ্রসম্প্রদায় আত্মবিক্রয় করে শহরে উঠে এসেছেন। গ্রামের আনন্দ-উৎসব রোগ- শোকের চাপে লুপ্ত হয়ে গেছে।

... ...

জমিদার আর গ্রামের সকল কর্মের প্রাণস্বরূপ নন...। নায়েব- গোমস্তার অত্যাচারে প্রজার প্রাণ ওষ্ঠাগত। মহাজনের হাতে জমির স্বত্ত্ব চলে যাচ্ছে। গৃহহীন ভূমিহীন লক্ষ লোক সমাজের অভিশাপ নিয়ে শহরের দিকে ছুটছে...। দেশে চুরি ডাকাতি বলাৎকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

... ...

জমিতে চাষীর স্বত্ত্ব নেই। ... কাউন্সিলে এবং খবরের কাগজে স্বরাজের জন্য চেঁচিয়ে আকাশ ফাটিয়ে দিচ্ছি। ... এই স্বরাজটা এখন হলে পাবে কে? যারা পাবে তারা নিজের হাতে যেটুকু দেওয়ার ক্ষমতা এখনই আছে তা সকলকে দিচ্ছে কি? আমরা স্বরাজের মামলা এটর্নি দিয়ে করাতে চাই না । এবার নিজেদেরই বুঝতে হবে। ... লাঙল চালিয়ে যিনি সীতাকে লাভ করেছিলেন সেই জনক আমাদের গুরু। যিনি Producer (জনক) তিনিই ঋষি, তিনিই সমাজের শ্রেষ্ঠ। আজ নব জনকের নতুন দর্শনে আমাদের জ্ঞান লাভ করতে হবে। Distributor হিসেবে জনকয়েক ভদ্রলোকের স্থান সমাজে আছে।

... ...

কিন্তু পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়ার ব্যবসা লোপ পাওয়া দরকার। ... "হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সমস্যা সব লাঙলের ফালের মুখে লোপ পাবে। তাই আমরা লাঙলের জয়গান আরম্ভ করলাম। 'লাঙল' নবযুগের নব দেবতা। জয় লাঙলের জয়। জয় লাঙলের দেবতার জয়।"

Dhaka University Institutional Repository

এটাই প্রথম বাংলায় ধনী ও নির্ধনের সংগ্রামের ঘোষণা। এই প্রথম স্বরাজের নামে শ্রেণীবিশেষের প্রতারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম যথার্থই বলেছেন-

"এদেশে কমিউনিস্ট ভাবধারা প্রচারের কাজে 'লাঙল'ই সম্ভবত প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র।"[১]

'লাঙল' এর নাম পরিবর্তিত করে 'গণবাণী' রাখা হয় ১৯২৬-এ। 'গণবাণী'তে নজরুল 'রেড ফ্লাগ' ও 'ইন্টারন্যাশনাল সঙ্গীতে'র অনুবাদ প্রকাশ করেন। 'লাঙল' ও 'গণবাণী'র যুগে বঞ্চিত ও নির্যাতিত মানুষের জন্যে তাঁর এক সুগভীর সহমর্মিতা লক্ষ্য করা যায় এবং তাঁর এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি 'সর্বহারা' 'ফণি-মনসা' 'সন্ধ্যা', 'প্রলয়-শিখা' ইত্যাদি কাব্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রতি নজরুলের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁর 'সাম্যবাদী' 'সর্বহারা' ও 'ফণি-মনসা'র বহু কবিতায় এর স্বাক্ষর রয়েছে। নজরুল সমাজের সবাইকে মানুষ হিসেবে দেখেছেন। তাদের কর্ম কিংবা আচরণের ওপর প্রাধান্য দেননি। 'চোর-ডাকাত' কবিতায় একথার সত্যতা মেলে। এ কবিতায় কবি সাম্যবাদী আদর্শের কাছাকাছি পৌঁছেছেন। এখানে মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও সহানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। সমাজে চোর, ডাকাত ঘৃণ্য। কিন্তু যে সমাজে সবাই চোর সেখানে তাদেরকে ঘৃণা করার অধিকার কারো নেই। দরিদ্রের সম্পদ চুরি করেই ধনীর সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রজার রক্ত শোষণ করেই রাজার প্রাসাদ নির্মিত হয়। নিরন্ন মানুষকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেই কলকারখানা গড়ে ওঠে। চোর ডাকাতরা বিত্তবানদের অর্থ চুরি করে, কিন্তু ধনীক শ্রেণী বিত্তহীন, অন্নহীনদের শ্রমকে চুরি করে। অতএব তারাই প্রকৃত চোর। সুতরাং অন্যদের ঘৃণা করার অধিকার তাদের নেই। কবি শোষিত শ্রেণীকে সচেতনতা দানের জন্য বলেন-

পালাবার পথ নাই,
দিকে দিকে আজ অর্থ-পিশাচ খুঁড়িয়াছে গড়খাই।
জগৎ হয়েছে জিন্দান খানা, প্রহরী যত ডাকাত—
চোরে-চোরে এরা মাস্তুত ভাই, ঠগে ও ঠগে স্যাঙাৎ।

(চোর-ডাকাত/ সাম্যবাদী)

কবিতায় নজরুল ধনতান্ত্রিক শোষণ প্রথার যে চিত্রাঙ্কন করেছেন তাতে মার্কসীয় অর্থনীতির কথা মনে আসাই স্বাভাবিক।

নজরুলের পরিকল্পিত সাম্য রাজ্যে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই, সবাই সমান। তাদের মধ্যে আর্থিক, ধর্মগত কিংবা বর্ণগত কোনো বৈষম্য বা ব্যবধান নেই।

গাহি সাম্যের গান—
বুকে বুকে হেথা তাজা সুখ ফোটে, মুখে মুখে তাজা প্রাণ!
বন্ধু, এখানে রাজা-প্রজা নাই, নাই দরিদ্র-ধনী,
হেথা পায় না ক' কেহ ক্ষুদ-ঘাঁটা, কেহ দুধ-সর- ননী।
... ...
পাদরী-পুরুত-মোল্লা- ভিক্ষু এক গ্লাসে খায় জল।

(সাম্য/সাম্যবাদী)

Dhaka University Institutional Repository

যুগ যুগ ধরে কুলি-মজুরের মত লক্ষকোটি শ্রমজীবী মানুষের হাতে গড়ে উঠেছে মানব সভ্যতা। এদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমে মোটর, জাহাজ, রেলগাড়ি চলছে। গড়ে উঠেছে দালানকোঠা, কলকারখানা। এদের শোষণ করেই ধনিক শ্রেণী হয়েছে বিত্ত-সম্পদের মালিক। কিন্তু যুগ যুগ ধরে সমাজে এরাই সবচেয়ে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত।

কবি নজরুল সমাজে শ্রমজীবী মানুষের ওপর সবলের অত্যাচার হতে দেখেছেন। হৃদয়বান কবি তা সহ্য করতে পারেননি। তাই তিনি বলেছেন -

দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি ব'লে এক বাবু সা'ব তারে ঠেলে দিল নিচে ফেলে!
চোখ ফেটে এল জল,
(কুলি-মজুর/ সাম্যবাদী)

পরক্ষণেই কবির বিপ্লবী চেতনা সঞ্চারক বাণী-

এমনি ক'রে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?
(কুলি-মজুর/ সাম্যবাদী)

শ্রমিককে 'বেতন দেওয়া' যে ফাঁকিবাজিরই নামান্তর একথা মার্কসের মতো নজরুলও স্বীকার করেন। নামমাত্র পারিশ্রমিক দিয়ে শ্রমিককে খাটিয়ে নেয়ার মাধ্যমেই ধনিকের মুনাফা অর্জিত হয়।

বেতন দিয়াছ? — চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল!
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোর পেলি বল্!
(কুলি-মজুর/সাম্যবাদী)

মার্কস্ মূলধনের গায়ে 'রক্ত আর ক্লেদ' প্রত্যক্ষ করেছেন আর নজরুল ধনীর প্রাসাদে দেখেছেন শ্রমিকের রক্ত —

তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা? — ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইটে আছে লিখা।
(কুলি-মজুর/সাম্যবাদী)

মানবতাবাদী কবির দৃঢ় বিশ্বাস, এই অবিচার আর চলবে না। শুরু হয়েছে দিন বদলের পালা। লাঞ্ছিত বঞ্চিতের দল জাগতে শুরু করেছে। তাদের সংঘবদ্ধ উত্থানের দিন এসেছে। অত্যাচারীকে অচিরেই চুকিয়ে দিতে হবে হিসাব-নিকাশের পালা। কবি এই শ্রমজীবী মানুষের বন্দনা করে বলেন, স্বার্থপর মানুষ এদের ঘৃণা করলেও এরাই প্রকৃতপক্ষে মানুষ রূপী দেবতা। এই শ্রমজীবী মানুষের ত্যাগের মাধ্যমে আসবে মানব মুক্তির নতুন দিন।

কবি নজরুল তাঁর কবিতায় একদিকে যেমন নির্যাতিত গণমানুষের চিত্রাঙ্কন করেছেন, অন্যদিকে এসব নিপীড়িত মানুষের বিপ্লবী উত্থানের কথাও বলেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

আসিতেছে শুভদিন,

দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ!

হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,

... ...

এই ধরণীর তরণীর হা'ল র'বে তাহাদেরি বশে।

(কুলি-মজুর/সাম্যবাদী)

কবির মতে পৃথিবীর শাসনভার তাদের হাতেই থাকবে যারা শ্রম দিয়ে সভ্যতা এবং সুরম্য অট্টালিকা গড়ার কাজে অবদান রাখে। কবির এই চিন্তাধারা মার্কস্ নির্দেশিত শ্রমিক শ্রেণীর একাধিপত্যের সমর্থক।

সামাজিক শোষণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও উচ্চারণ করেছেন কিন্তু এ সম্পর্কিত তাঁর চেতনা প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হয়নি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পর সামাজিক অবিচার ও অসাম্যের আর্থিক কারণ নির্ণয়ের কাজে নজরুল নিজেকে যথার্থভাবে নিয়োজিত করেছিলেন।

শোষিত, নির্যাতিতের প্রতি নজরুলের বিপ্লবী আহবান নিম্নোক্ত অংশেও উচ্চারিত হয়েছে-

মহা-মানবের মহা-বেদনার আজি মহা- উত্থান,

উর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নিচে কাঁপিতেছে শয়তান!

(কুলি-মজুর/ সাম্যবাদী)

এখানে 'মহা-উত্থান' শব্দের দ্বারা কবি শ্রমজীবী মানুষের বিপ্লবী সম্ভাবনার প্রতি ইংগিত দিয়েছেন। এ কবিতায় শ্রেণী- সংগ্রাম ও বিপ্লবের চেতনা পরিপূর্ণতা পেয়েছে। সারা পৃথিবী জুড়ে বিপ্লবের মধ্য দিয়েই সাম্যবাদের বিশ্বায়ন ঘটবে বলে কবির বিশ্বাস।

নজরুল বঞ্চিত সর্বহারাদের শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় তাঁর কাব্যে সর্বহারাদের বাণী ভাষা পেয়েছে। রিক্ত সর্বহারা চাষীদের, মজুরদের মর্মবাণী ফুটে উঠেছে নজরুলের কাব্যে 'খর খড়গ সম'। বঞ্চিত, শোষিত কৃষকদের চিত্তক্ষোভ কবির লেখনীতে বলিষ্ঠ ভাষা পেয়েছে-

ওঠ্ রে চাষী জগদ্বাসী ধর্ ক'ষে লাঙল।

আমরা মর্‌তে আছি- ভাল ক'রেই মর্‌ব এবার চল্॥

মোদের উঠান-ভরা শস্য ছিল হাস্য-ভরা দেশ

ঐ বৈশ্য দেশের দস্যু এসে লাঞ্ছনার নাই শেষ,

ও ভাই লক্ষ হাতে টান্‌ছে তারা লক্ষ্মী মায়ের কেশ,

আজ মা'র কাঁদনে লোনা হ'ল সাত সাগরের জল॥

Dhaka University Institutional Repository

ও ভাই আমরা ছিলাম পরম সুখী, ছিলাম দেশের প্রাণ
তখন গলায় গলায় গান ছিল ভাই, গোলায় গোলায় ধান,
আজ কোথায় বা সে গান গেল ভাই কোথায় সে কৃষাণ?

(কৃষাণের গান/সর্বহারা)

নজরুল প্রথম থেকেই তাঁর সাহিত্যে নির্যাতিত মানুষের দুঃখ ও বেদনাকে স্থান দিয়েছেন। সচেতন সাম্যবাদী নজরুল একটা বিশেষ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বঞ্চিত-শোষিত শ্রেণীর কথা উচ্চারণ করেছেন। একজন অনুরাগী পাঠকের পত্রের উত্তর দিতে গিয়ে কবি লিখেছেন —

"... আপনি কি আমার বর্তমান লেখাগুলো পড়েছেন? আমি জানি না— লেখা প্রাণহীন হচ্ছে কিনা। ... আমার লেখার উদ্দামতা হয়ত কমে আসছে— তার কারণ আমার সুরের পরিবর্তন হয়েছে। আপনি কি আমার "সাম্যবাদী" পড়েছেন?... আমি আমার মনের কুঞ্জে আমার বংশী- বাদকের বিদায় পদধ্বনি আজও শুনতে পাইনি। তবে তার নবীনতর সুর শুনেছি। সেই সুরের আভাস আমার "সাম্যবাদী"তে পাবেন।"

(আনওয়ার হোসেনকে লিখিত পত্রঃ নজরুল রচনা-সম্ভার, আবদুল কাদির)

নজরুলের কাব্যের এই 'নবীনতর সুর' যে সাম্যের সুর একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর 'সাম্যবাদী' ও 'সর্বহারা' কাব্যদ্বয়ের ভাবসম্পদ মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। নজরুলের 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'চোর-ডাকাত', 'রাজা-প্রজা', 'সাম্য', 'কুলি-মজুর', 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'কৃষাণের গান', 'শ্রমিকের গান', 'ধীবরদের গান', 'ফরিয়াদ' এবং 'প্রলয়-শিখা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'চাষার গান' এবং 'শূদ্রের মাঝে জাগিছে রুদ্র' প্রভৃতি কবিতায় সমাজ ব্যবস্থার আর্থিক অসাম্য ও শোষণের কথাই বলা হয়েছে। নজরুল সাহিত্যের সর্বত্রই শ্রেণী সচেতনতা ও সাম্যবাদী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। যেমন-

আজ চারদিক হতে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত
ও ভাই জোঁকের মতন শুষ্‌ছে রক্ত, কাড়ছে থালার ভাত,
মোর বুকের কাছে মর্‌ছে খোকা, নাই ক' আমার হাত্‌।
আজ সতী মেয়ের বসন কেড়ে খেলছে খেলা খল॥

(কৃষাণের গান/ সর্বহারা)

যে সব কিছু হারিয়েছে তার হারাবার আর তো কিছু বাকি নেই। অতএব তার ভীত হওয়ার কথা নয়। কবি নজরুল 'কৃষাণের গান'- এ বলেছেন, কৃষক তার সর্বস্ব হারিয়েছে, আর তাই তার পিছু টানও নেই।

অতএব কৃষককে অপ্রাপ্তিতে করুণ আর্তনাদ না করে প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। অত্যাচারী শোষক শ্রেণীকে পদানত করতে সাধারণ সর্বহারা কৃষক, জেলে, মুটে, মজুর সবাইকে কবি বিপ্লবী আহবান জানিয়েছেন, বিপ্লবী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন —

Dhaka University Institutional Repository

আজ জাগ্ রে কৃষাণ, সব ত গেছে, কিসের বা আর ভয়,
এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।
ঐ বিশ্বজয়ী দস্যুরাজার হয়- কে করব নয়,
ওরে দেখ্‌বে এবার সভ্যজগৎ চাষার কত বল॥

(কৃষাণের গান/ সর্বহারা)

শুধু কৃষাণের দুর্দশার কথা নয়, শরীরের ঘাম ঝরিয়ে নগরে প্রান্তরে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যারা কাজ করে সেই শ্রমিকদের করুণ সংগীতও নিনাদিত হয়েছে কবির কণ্ঠে-

ও ভাই আমরা কলির কলের কুলি,
কলুর বলদ চক্ষে-ঠুলি
হীরা পেয়ে রাজ- শিরে দিই তুলি' রে !

(শ্রমিকের গান/ সর্বহারা)

অন্যত্র,

যত শ্রমিক শু'যে নিঙড়ে প্রজা
রাজা-উজির মারছে মজা,
আমরা মরি বয়ে তাদের বোঝা রে।

(শ্রমিকের গান/ সর্বহারা)

ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত শ্রমিকের প্রতিবাদের কণ্ঠ রুদ্ধ। এবার নিজের পাওনা বুঝে নেবার জন্য ঘুরে দাঁড়াবার সময় এসেছে। অত্যাচারীর অত্যাচার রুখতে কবির সংগ্রামী উচ্চারণ —

মোদের যা ছিল সব দিইছি ফুঁকে,
এইবারে শেষ কপাল ঠুকে
পড়ব রুখে অত্যাচারীর বুকে রে!

(শ্রমিকের গান/ সর্বহারা)

নিম্নোক্ত অংশেও কবি সর্বহারা শ্রমিকদের উদাত্ত ভাষায় সংগ্রামে আহবান জানিয়েছেন—

ঐ শয়তানী চোখ কলের বাতি
নিবিয়ে আয় রে ধ্বংস-সাথী!
ধর্ হাথিয়ার, সামনে প্রলয়-রাতি রে!
আয় আলোক-স্নানের যাত্রীরা আয়

Dhaka University Institutional Repository

আঁধার-নায়ে চড়বি চল্!

ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

(শ্রমিকের গান/ সর্বহারা)

শোষণে পীড়িত জেলেদের জীবন- সমস্যার রূপ চরম প্রতিবাদের ভাষায় ফুটে উঠেছে, 'ধীবরদের গান' এ। এতে শ্রেণী বিভেদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। কবির ভাষায়-

হায় ভাই রে, মোদের ঠাঁই দিল না

আপন মাটির মায়ে,

তাই জীবন মোদের ভেসে বেড়ায়

ঝড়ের মুখে নায়ে।

(ধীবরদের গান/সর্বহারা)

কবি নিষ্ঠুর শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জেলে সম্প্রদায়কে উদ্দীপিত করতে চেয়েছেন। বিপ্লবী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের প্রত্যাশায়-

কাটব অসুর এলে!

এবার উঠব রে সব ঠেলে॥

(ধীবরদের গান/ সর্বহারা)

দেখা যাচ্ছে, 'কৃষাণের গান', 'শ্রমিকের গান', 'ধীবরদের গান' ইত্যাদি কবিতায় নজরুলের গণতান্ত্রিক সমাজবাদের আদর্শ ও স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে।

সমাজে উচ্চবর্গের শোষণে নিম্নবর্গের মানুষের সকরুণ অসহায় অবস্থার চিত্র পাওয়া যায় নজরুলের কাব্যে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও তাঁর কাব্যে কৃষাণ- মজুরের জয়গান গেয়েছেন এবং সভ্যতার বিনির্মাণে তাদের শ্রমের মর্যাদা দিয়েছেন। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তও নির্যাতিত কৃষক-মজুরদের দুঃখ-বেদনাকে সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। কিন্তু নজরুল হতদরিদ্র সর্বহারাদের যেভাবে বুকে তুলে নিয়েছেন, নিজের জীবনের পাওয়া না পাওয়ার বেদনার সঙ্গে শোষিত মানুষের হৃদয়ের আর্তির যে যোগসূত্র রচনা করেছেন, যে বলিষ্ঠ ভাষায় তাদের বঞ্চিত জীবনের দুঃখ -ক্লেশকে পদদলিত করে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দৃপ্ত ইঙ্গিত দিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যে তুলনারহিত।

নজরুল সারাজীবন ধরে শোষণ, অনাচার আর ভেদনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদে সবার সমান অধিকার রয়েছে। অথচ কিছু মানুষ সমুদয় সম্পদ কুক্ষিগত করবে আর অবশিষ্ট জনতা বঞ্চিত হবে তা হতে পারে না। নজরুল তাই ভগবানের দরবারে নালিশ জানিয়েছেন-

এই ধরণীর যাহা সম্বল, —

বাসে-ভরা ফুল, রসে ভরা ফল,

Dhaka University Institutional Repository

সু-স্নিগ্ধ মাটি, সুধাসম জল, পাখির কণ্ঠে গান, —
সকলের এতে সম অধিকার, এই তাঁর 'ফরমান'!
ভগবান! ভগবান!

(ফরিয়াদ/সর্বহারা)

জনগণের রক্ত শোষণকারীই সমাজে মহাজন নাম নিয়ে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত। এখানে মহাজন শব্দকে কবি ব্যঙ্গার্থে ব্যবহার করেছেন। সন্তানের ন্যায় জমিকে যারা লালন-পালন করে তারা জমিদার নয়। মাটিতে যাদের চরণ পড়ে না তারাই মাটির মালিক হয়। কবি এখানে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ভ্রান্ত নীতির সমালোচনা করার পাশাপাশি সামাজিক নৈরাজ্যের জন্য সামন্ততান্ত্রিক পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। কেননা,এ জাতীয় সমাজ ব্যবস্থায়ই সুযম বন্টনের অভাবে সমাজে অসাম্য ও বৈষম্য সৃষ্টি হয়; সৃষ্টি হয় মুনাফাখোর দলের। আর তারা তাদেরই স্বার্থে সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে চালিত করে। এভাবেই শোষণের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। 'ফরিয়াদ' কবিতায় কবি ক্ষোভের সঙ্গে ধিক্কার দিয়ে উচ্চারণ করেছেন —

জনগণে যারা জোঁক সম শোষে তারে মহাজন কয়,
সন্তান সম পালে যারা জমি তারা জমি-দার নয় ।
মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ,
মাটির মালিক তাঁহারাই হন!

(ফরিয়াদ/ সর্বহারা)

আলোচ্য কবিতায় কবি জনগণের পক্ষে অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠ। কবি এখানে অত্যাচারী, শোষক এবং মহাজনদের অত্যাচার ও শোষণের চিত্রাঙ্কনের পাশাপাশি বিপ্লবের প্রচণ্ড উন্মাদনা সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। শোষিত জনগণের পক্ষ হয়ে কবি অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এভাবে—

কে আছে এমন ডাকু যে হরিবে আমার গোলার ধান?
আমার ক্ষুধার অন্নে পেয়েছি আমার প্রাণের ঘ্রাণ —

(ফরিয়াদ/সর্বহারা)

এর পরবর্তীতে কবির বিপ্লবী ঘোষণা-

জয় নিপীড়িত প্রাণ!
জয় নব অভিযান!
জয় নব উত্থান!

(ফরিয়াদ/সর্বহারা)

খাদ্য মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের একটি। যেখানে পেটে ক্ষুধার যন্ত্রণা নিয়ে মানুষকে দিনাতিপাত করতে হয় সেখানে অপর সব কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হতে বাধ্য। ভাতের অভাবে মানুষ জীবনের স্বপ্ন দেখতেও

Dhaka University Institutional Repository

অপারগ। যেখানে ন্যূনতম মানবিক চাহিদা তাদের জীবনে নিশ্চিত নয় সেখানে তারা স্বরাজ চায় না, চায় না চরকার গান। তাদের প্রয়োজন এক মুঠো ভাত। 'আমার কৈফিয়ত' কবিতায় কবি বলেছেন-

ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন।
বেলা ব'য়ে যায়, খায়নি ক' বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন!
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায়,
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়!
কেঁদে বলি, ওগো ভগবান তুমি আজিও আছ কি? কালি ও চুন
কেন ওঠে না ক' তাহাদের গালে, যারা খায় এই শিশুর খুন?

(আমার কৈফিয়ত/সর্বহারা)

উপর্যুক্ত স্তবকে চির শোষিত, চির দুঃখী সর্বহারাদের অন্তর্জ্বালা কবি যে গভীর দরদ ও ক্ষোভের সঙ্গে তুলে ধরেছেন তার তুলনা বাংলা কবিতায় পাওয়া দুঃসাধ্য।

এ কবিতায় স্বরাজ বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার ছদ্মাবরণে স্বদেশী শাসক ও শোষকের উত্থানের কথা এসেছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ যে আর্থিক মুক্তি নয়, শোষণের অবসান নয়, এ বোধ কবিকে যন্ত্রণাকাতর করেছে, ক্ষুব্ধ করেছে। কবি তাই শোষণের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্যে এবং জনগণকে প্রতিরোধ কর্মসূচীতে সংশ্লিষ্ট করার জন্য 'রক্ত-লেখা'য় আহবান জানান-

বন্ধু গো আর বলিতে পারি না, বড় বিষ- জ্বালা এই বুকে!
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,

(আমার কৈফিয়ত/ সর্বহারা)

নজরুল নিজের সাহিত্যকর্মের অমরত্ব নিয়ে মোটেও চিন্তিত হননি। বরং তিনি প্রচলিত ভেদ-বৈষম্য-ক্লিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার প্রতি কঠোর নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন এবং সর্বহারার ক্রন্দন বেদনার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। চারিদিকে পর্বত প্রমাণ মিথ্যাচার, অত্যাচার আর শোষণের হোলিখেলা দেখে নজরুল নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেননি। তিনি রক্তশোষক মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষীদের অভিশম্পাত দিয়েছেন এবং ক্রোধের বহিঃ প্রকাশ ঘটিয়েছেন —

প্রার্থনা ক'রো — যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ!

(আমার কৈফিয়ত/ সর্বহারা)

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল তাঁর আবেগী মনন ও মেধায়, চিন্তা, স্বপ্ন ও কল্পনায় যে সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তা অবশ্যই আধুনিক শোষণমুক্ত সমাজ। তাঁর উদাত্ত আহবান-

জাগো অনশন-বন্দী, ওঠ রে যত

জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত।

(অন্তর- ন্যাশনাল সঙ্গীত/ ফণি-মনসা)

'ফণি-মনসা' কাব্যের অন্তর্গত 'অন্তর- ন্যাশনাল সঙ্গীত' কবিতায় কবি 'অনশন-বন্দী' জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত সর্বহারাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অংশ গ্রহণের জন্য উদাত্ত কণ্ঠে আহবান জানিয়েছেন। অত্যাচারী, সঞ্চয়ীদের কব্জা থেকে নিজেদের পাওনা আদায়ের জন্য তিনি দৃঢ়তার সাথে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানিয়েছেন জনগণকে-

ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম-মাঝ

নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ!

(অন্তর -ন্যাশনাল সঙ্গীত/ ফণি-মনসা)

'ফণি-মনসা' কাব্যেও কবি শ্রমিক শ্রেণীকে তাদের শ্রমের মর্যাদা দিয়েছেন। তাদের 'সব মহিমার উত্তর-অধিকারী' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই শ্রমিক শ্রেণী সর্ব প্রকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও তারা অবহেলিত থাকবে, বঞ্চিত থাকবে, এটা কবির পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব হয়নি। অতএব শ্রমিকদের তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এতে ভয়ের কিংবা অনিশ্চয়তার কিছু নেই, কারণ প্রতিপক্ষ সংখ্যালঘু এবং প্রতিপক্ষ অপেক্ষা তারাই শক্তিধর।

ঝেড়ে ফেল্ সব, সমীরে যেমন ঝরায় শিশির -বারি।

উহারা ক'জন? তোরা অগণন সকল শক্তি-ধারী॥

(জাগর-তূর্য/ফণি-মনসা)

কুচক্রী শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র এবং স্বার্থান্বেষী ধর্মধ্বজী ভণ্ডদের দেয়া ধর্মীয় অপব্যাখ্যার কারণে গণমনে ধর্মীয় ভেদবুদ্ধির উদয় হয়, যা তাদের আত্মকলহে লিপ্ত করে। এ হানাহানি থেকে গণশ্রেণীকে রক্ষা করার জন্য, তাদের বিভ্রান্তি দূর করার জন্য, সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্য 'নব-বিপ্লব-ঘোড়সওয়ারী' নজরুল আওয়াজ তোলেন-

নিন্দাবাদের বৃন্দাবনে ভেবেছিলাম গাইব না গান,

থাকতে নারি দেখে শুনে সুন্দরের এই হীন অপমান।

(পথের দিশা/ ফণি-মনসা)

Dhaka University Institutional Repository

কবির স্বভাবজ বিপ্লবী মন্ত্র শোনা যায় 'নকীব' কবিতায়। নজরুল সর্বপ্রকার শোষণের অবসান ঘটিয়ে নতুন জীবনের সন্ধান দেয়ার জন্য নেতৃত্বকে আহবান জানিয়েছেন।

নব-জীবনের নব-উত্থান - আজান ফুকারি' এস নকীব।
জাগাও জড়! জাগাও জীব!

জাগে দুর্বল, জাগে ক্ষুধা-ক্ষীণ
জাগিছে কৃষাণ ধুলায়-মলিন,
জাগে গৃহহীন, জাগে পরাধীন
জাগে মজ্‌লুম বদ্‌-নসীব!

(নকীব/জিঞ্জীর)

শোষিত বঞ্চিত মানুষের দুর্দশার বিরুদ্ধে সুকান্ত ভট্টাচার্যও তাঁর উত্তপ্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'সিঁড়ি', সিগারেট,' 'দেশলাই কাঠি', 'রানার', 'উদ্বীক্ষণ' প্রভৃতি কবিতার নাম উল্লেখ করা যায়। 'উদ্বীক্ষণ' কবিতায় কবি বলেছেন-

নগরে ও গ্রামে জমেছে ভিড়
ভগ্ননীড়,—
ক্ষুধিত জনতা আজ নিবিড়।
সমুদ্রে জাগে বাড়বানল,
কী উচ্ছল,
তীরসন্ধানী ব্যাকুল জল।
কখনো হিংস্র নিবিড় শোকে,
দাঁতে ও নখে—
জাগে প্রতিজ্ঞা অন্ধ চোখে।
তবু সমুদ্র সীমানা রাখে,
দুর্বিপাকে
দিগন্তব্যাপী প্লাবন ঢাকে।

('উদ্বীক্ষণ'/'ঘুমনেই')

সুকান্ত লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে নজরুলের প্রভাবে প্রভাবান্বিত।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল এ পৃথিবীতে বিচিত্র উপায়ে শোষকের শোষণ প্রক্রিয়া চলতে দেখেছেন। যেখানে স্বয়ং প্রভু তার অধস্তনকে শোষণ করে সেখানে শোষিতের 'শেষ আশ্রয়' বলে আর কিছু থাকতে পারে না। নজরুল তাই তরুণদেরকে ডাক দিয়েছেন শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার জন্য অগ্রে গমন করতে—

জগতের এই বিচিত্রতম মিছিলে ভাই
কত রূপ কত দৃশ্যের লীলা চলে সদাই! —
শ্রমরত ঐ কালি-মাখা কুলি, নৌ-সারং,
বলদের মাঝে হলধর চাষা দুখের সং,
প্রভু স- ভৃত্য পেষণ- কল, —
অগ্র-পথিক উদাসী-দল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্॥

(অগ্র-পথিক/ জিঞ্জীর)

শোষণ আর সঞ্চয় যে মানবতার পরিপন্থী কাজ তার পক্ষে ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান আছে। নজরুল 'ঈদ- মোবারক' কবিতায় সে প্রসঙ্গ এনেছেন।

ইসলাম বলে, সকলের তরে মোরা সবাই,
সুখ-দুখ সম-ভাগ ক'রে নেব সকলে ভাই,
নাই অধিকার সঞ্চয়ের!

(ঈদ-মোবারক /জিঞ্জীর)

এখানে কবি পুঁজিবাদের বিপক্ষে সুদৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন। রাবণকে শোষক ও রামকে শোষিতের প্রতীক রূপে বর্ণনা করে পৌরাণিক রূপকে শোষক ও শোষিতের আসন্ন সংগ্রাম এবং শোষকের উৎখাতের সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করেছেন নজরুল,-

দশমুখো ঐ ধনিক রাবণ,
দশদিকে আছে মেলিয়া মুখ,
বিশ হাতে করে লুণ্ঠন, তবু
ভরে না ক'ওর ক্ষুধিত বুক।
হয়ত গোকুলে বাড়িছে সে আজ,
উহারে কল্য বধিবে যে,
গোয়ালার ঘরে খেঁটে-লাঠি- করে
হলধর-রূপী রাম সেজে!

(পূজা-অভিনয়/প্রলয়-শিখা)

ভিক্ষুক, কৃষক, শ্রমিক, কুলি, রাজমিস্ত্রি, তাঁতি, মেথর, হাড়ি ডোম, দারোয়ান, সেবাদাস প্রভৃতি মেহনতী বা সমাজের নিচু তলার নির্যাতিত মানুষের প্রতি নজরুল যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন এবং সাথে সাথে এসব অস্পৃশ্য শূদ্রের মাঝে যে রুদ্র দেবতার সন্ধান পেয়েছেন তা মহাত্মা গান্ধীর ভাববাদী সমাজ নীতি বা কবি সত্যেন্দ্রাথ দত্তের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তুলনীয়। কিন্তু এসব দর্শনের শূন্যতা নজরুলের কবিতায় ঠিকই ধরা পড়েছে —

Dhaka University Institutional Repository

ভেবেছিলে বুঝি, ছলের ঠাকুর,
মর্ত্যের অধিবাসী সব
তোমারে চিনিয়া এই রূপে রূপে
পূজিয়া করিবে পরাভব।
যত সেবা দাও, তত করে ঘৃণা,
দেখিতে দেখিতে চারি কাল
হইল অন্ত, ধূর্জটি তাই
ক্ষেপিয়ে উঠেছে জটাজাল?

(শূদ্রের মাঝে জাগিছে রুদ্র/ প্রলয়- শিখা)

অবশেষে কবি 'শূদ্ররূপী রুদ্র ভীষণ ভৈরব'— কে প্রণতি জানিয়েছেন এবং শূদ্ররূপী রুদ্র অর্থাৎ সমাজের বঞ্চিত অংশের প্রতি অবহেলা আর অপমান প্রত্যক্ষ করে কবি এ পাপ ধরণীতে বেঁচে থাকার আগ্রহও হারিয়েছেন।

'গরিবের ব্যথা' কবিতায় নিরন্ন মানুষদের প্রতি কবির যে দরদের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা বিরল। দারিদ্র্য সীমানার মধ্যে নজরুলের বিচরণ বলে তিনি নিরন্ন, অভাবগ্রস্ত মানুষকে খুব কাছে থেকে দেখে দুঃখের প্রকৃত চেহারা অবলোকনে সক্ষম হয়েছেন। কবিতায় কবি শোষক শ্রেণীকে প্রশ্ন করেছেন-

এদের ফেলে ওগো ধনী, ওগো দেশের রাজা,
কেমন করে রোচে মুখে মণ্ডা মিঠাই খাজা?

(গরিবের ব্যথা/নির্ঝর)

কৃষক, শ্রমিক তথা নিপীড়িত সর্বহারাদের প্রতি নজরুলের চিরন্তন বেদনা ও সহানুভূতির প্রকাশ অব্যাহত ছিল তাঁর বাক হারাবার পূর্ব পর্যন্ত। অর্থনৈতিক শোষণে পর্যুদস্ত কৃষকের আর্তনাদের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'ওঠ রে চাষী' কবিতায়। এই কবিতায় কৃষকের প্রতি প্রশ্ন করার ছলে প্রকৃতপক্ষে নজরুল তাদের বিঘ্নসংকুল জীবনের দৈন্যদশাকেই তুলে ধরেছেন। কবির জিজ্ঞাসা প্রকৃতপক্ষে কৃষক সমাজেরই জিজ্ঞাসা-

চাষী রে! তোর মুখের হাসি কই?
তোর গো -রাখা রাখালের হাতে বাঁশের বাঁশি কই?

(ওঠ রে চাষী /নতুন চাঁদ)

কবি কৃষকদের দূরবস্থার জন্য ধনীদের দায়ী করেছেন। তাঁর বিশ্বাস কৃষকদের রক্ত শোষণ করেই ধনীদের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়। তিনি কৃষকদের করুণ অবস্থার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে এ সত্য তুলে ধরেছেন-

তোর হাঁড়ির ভাতে দিনে রাতে যে দস্যু দেয় হাত,
তোর রক্ত শুষে হল বণিক, হল ধনীর জাত —

(ওঠ রে চাষী / নতুন চাঁদ)

Dhaka University Institutional Repository

কৃষকের বঞ্চিত জীবন নিয়ে কবি কেবল হাহাকার বা ক্ষোভই প্রকাশ করেননি, এর প্রতিকার কামনা করে সংগ্রামী চেতনাও জাগ্রত করার প্রয়াস পেয়েছেন —

তাদের হাড়ে ঘুণ ধরাবে তোদেরই এই হাড়

তোর পাঁজরার ঐ হাড় হবে ভাই যুদ্ধের তলোয়ার!

(ওঠ রে চাষী/ নতুন চাঁদ)

শোষণের, নির্যাতনের শিকার জনগণের সংখ্যাই অধিক। পক্ষান্তরে শোষক শ্রেণী সংখ্যায় অল্প। অতএব নির্যাতিতের দলই শক্তিশালী। নির্যাতিতের নব-জাগরণের দিন এসে গেছে। শোষকদের শোষণের দিন শেষ হয়ে এসেছে। কবি সর্বহারা জনতাকে সংগ্রামী আহবান জানিয়ে বলেছেন—

মোরা জনগণ, শতকরা মোরা নিরানব্বই জন,

মোরাই বৃহৎ, সেই বৃহতের আজ নব-জাগরণ।

ক্ষুদ্রের দলে কে যাবে তোমরা ভোগবিলাসের লোভে?

আর দেরি নাই, ওদের কুঞ্জ ধূলি-লুণ্ঠিত হবে!

(নবযুগ/শেষ সওগাত)

মানব দরদি কবি নজরুল 'জয় হোক! জয় হোক' কবিতায় দরিদ্র কৃষক, শ্রমিক তথা আপামর জনগণের অধিকার নিশ্চিত হোক এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

রবে না দারিদ্র্য, রবে না অসাম্য,

সমান অন্ন পাবে নাগরিক গ্রাম্য,

রবে না বাদশা রাজা জমিদার মহাজন,

কারো বাড়ি উৎসব কারো বাড়ি অনশন,

কারো অট্টালিকা কারো খড়-হীন ছাদ,

রবে না এ ভেদ, সব ভেদ হবে বরবাদ।

(জয় হোক! জয় হোক / গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত)

কবি দরিদ্র, বঞ্চিত, শোষিতদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি সর্বহারাদের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে বিশ্বে লোভী আর ভোগীদের স্বার্থপরতাকে ধ্বংস করার আহবান জানিয়েছেন। শোষিতদের সংঘবদ্ধ হয়ে শোষকদের বিরুদ্ধে প্রাণ-পণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার বিপ্লবী প্রেরণা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন 'দরিদ্র মোর পরমাত্মীয়' কবিতায়। কবির বিপ্লবী প্রেরণাদায়ক উচ্চারণ—

Dhaka University Institutional Repository

আমরা গরিব মোরা শতকরা নিরানব্বই জন,
আমরা সংঘবদ্ধ হইব করিয়া পরান-পণ।
লোভী রাক্ষস ভোগীদের সংহার করি পৃথিবীতে
পূর্ণ সাম্য আনিব, দানিব অমৃত বঞ্চিতে।

(দরিদ্র মোর পরমাত্মীয়/ গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত)

এখানে কবির সাম্যবাদী মনের পরিচয় প্রকাশিত।

মজুর, শ্রমিক নিজেদের সক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা নির্যাতিত হতে হতে আত্মশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। তাদের প্রকৃত শক্তির প্রয়োগ ঘটাতে হবে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। কবি তাই 'শ্রমিক মজুর' কবিতায় বলেছেন—

যে হাত হাতুড়ি দিয়া গড়িয়াছি প্রাসাদ হর্ম্যরাজি,
সেই হাত দিয়া বিলাস-কুঞ্জ ধ্বংস করিব আজি।
দেয় নাই ওরা পারিশ্রমিক মজুরের শ্রমিকের—
যা দিয়েছে, তাহে মেটেনি মোদের ক্ষুধা তৃষা ক্ষণিকের!
মোদের প্রাপ্য আদায় করিব, কব্‌জি শক্ত কর;
গড়ার হাতুড়ি ধরেছি, এবার ভাঙার হাতুড়ি ধর!

(শ্রমিক মজুর/ গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত)

কেবল কবিতায় নয়, উপন্যাস এবং প্রবন্ধেও নজরুল শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে প্যাঁকালে পরিবারের দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনের এক মর্মান্তিক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। যে নিপীড়িত মানবাত্মার জন্যে কবির সংবেদনশীল মন বেদনাক্লিষ্ট হয়ে উঠেছিল 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে তারই গ্লানিময় পরাজয়ের ছবি রূপায়িত হয়েছে। এই উপন্যাসে দেখা যায় নজরুলের আনসার শ্রমিকদের নিয়ে শ্রমিকসংঘ গড়তে তৎপর। সে বলে, "আমি চিরকালই ঠিক আছি। একেবারে বিনা কাজে আসিনি আগেই বলেছি। এখানে একটা শ্রমিকসংঘ গড়ে তুলতে এসেছি। প্রত্যেক জেলায় আমাদের শ্রমিকসংঘের একটা করে শাখা থাকবে। আপাতত সেই মতলবেই ঘুরে বেড়াচ্ছি সব জায়গায়।" প্রকৃতপক্ষে নজরুল শোষিতদের জীবনের সর্বক্ষেত্রের মুক্তি নিশ্চিত করতে চেয়েছেন।

'কুহেলিকা' উপন্যাসেও বঞ্চিত শ্রেণীর বেদনায় নজরুল ব্যথিত। কৃষক শ্রেণীর কথা প্রসঙ্গে জাহাঙ্গীরের মুখে যা উচ্চারিত হয়েছে তা যে নজরুলের প্রাণের কথা তা সহজেই বুঝে নেয়া যায়। জাহাঙ্গীর বলে, "তাই ভাবছি হারুন, এত বিপুল শক্তি এত বিরাট প্রাণ নিয়েও এরা পড়ে আছে কোথায়। এরা যেন উদাসীন আত্মভোলার দল, সকলের জন্য সুখ সৃষ্টি করে নিজে ভাসে দুঃখের অথৈ পাথারে। এরা শুধু কবি নয় হারুন, এরা মানুষ! এরা সর্বত্যাগী তপস্বী দরবেশ! এরা নমস্য।"

Dhaka University Institutional Repository

অন্যত্র কুলির প্রসঙ্গে জাহাঙ্গীর বলে, "অন্যায় করেছি বন্ধু একজন মানুষের বোঝা আমারি মত আরেকজন মানুষের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে। কিন্তু আমরা এসে পড়েছি। অর্থ দিয়ে কি মানুষের হাতের সেবার, তার শ্রমের প্রতিদান দেওয়া যায়? এখন এই রাস্তাটুকু ওদের শুদ্ধ কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গেলেও এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না! মানুষের একটা নূতন বেদনার দিক দেখতে পেলাম আজ। এতদিন বই-এর পাতায় যাকে দেখেছি আজ চোখের পাতায় তার দেখা পেলাম!..."

উপর্যুক্ত বক্তব্যে এটা স্পষ্ট যে নজরুল নির্যাতিত তথা পশ্চাদপদ মানবশ্রেণীর অবস্থার পরিবর্তনে বিশেষ আগ্রহী।

উৎপীড়িতের প্রাণ-শিখা জ্বালাবার আকাঙ্ক্ষা নজরুলের প্রবন্ধেও ব্যক্ত হয়েছে। 'যুগবাণী' প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্গত 'ধর্মঘট' প্রবন্ধে নজরুল উপেক্ষিত নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামী রূপকে বন্দনা করেছেন, নিজেদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে তারা উদ্বুদ্ধ হোক এ কামনা করেছেন। শোষিত অবজ্ঞেয় মানুষের মধ্যেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন নবমানবশক্তির উজ্জীবন। এই প্রবন্ধে নজরুল বলেন—

"এই ধর্মঘটের আগুন এখন দাউদাউ করিয়া সারা ভারতময় জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং ইহা সহজে নিভিবার নয়, কেননা, ভারতেও এই পতিত উপেক্ষিত নিপীড়িত হতভাগাদের জন্য কাঁদিবার লোক জন্মিয়াছে,এ-দেশেও মহত্তর মানবতার অনুভব সকলেই করিতেছেন। সুতরাং শ্রমজীবীদলেও সেই সঙ্গে তথাকথিত গণতন্ত্র ও ডিমোক্র্যাসির জাগরণও এ-দেশে দাবানলের মতো ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং পড়িবে। কেহই উহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।"

'যুগবাণী'র অপর প্রবন্ধ 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন'-এ কৃষক, মজুর প্রভৃতি উপেক্ষিত মানুষের প্রতি নজরুল অবিচল আস্থার কথা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর বিশ্বাস এই উপেক্ষিত শ্রেণীই অসাধ্য সাধনের ক্ষমতা রাখে। এই শ্রেণীর দুঃখ বেদনার কারণ তাদেরই নীরবতা। মহাত্মা গান্ধীর প্রসঙ্গ টেনে এনে তিনি বলেন উপেক্ষিত শক্তির সহায়তায়ই অসাধ্য সাধিত হতে পেরেছিল। অতএব, "যদি পার, এমনি করিয়া ডাক, এমনি করিয়া এই উপেক্ষিত শক্তির বোধন কর -দেখিবে ইহারাই দেশে যুগান্তর আনিবে, অসাধ্য সাধন করিবে।"

নির্যাতিত, বঞ্চিত ও শোষিত মানুষের কবি নজরুল। "তিনি সত্তা-অচেতন জড় জাতির জীবনে নতুন করে প্রাণ-স্পন্দন দিয়েছিলেন। দারিদ্র্য-দাসত্ব-অশিক্ষা-শোষণ জর্জরিত স্বদেশবাসীর জন্যে তাঁর আকুলতার সীমা ছিল না, ক্ষোভের ছিল না অন্ত। এই ক্ষোভ ও আকুলতাই তাঁকে বিদ্রোহী ও বিপ্লবী করেছিল।"[২]

নির্যাতিত,শোষিত, বঞ্চিত মানুষকে সচেতনতা দানই ছিল কবি নজরুলের ব্রত। 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন-

"এ ক্রন্দন কি একা আমার? না—এ আমার কণ্ঠে ঐ উৎপীড়িত নিখিল-নীরব ক্রন্দসীর সম্মিলিত সরব প্রকাশ? আমি জানি, আমার কণ্ঠের ঐ প্রলয়-হুঙ্কার একা আমার নয়,সে যে নিখিল আত্মার যন্ত্রণা-চিৎকার।"

Dhaka University Institutional Repository

'রুদ্র-মঙ্গল' প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্গত 'রুদ্র-মঙ্গল' প্রবন্ধে নজরুল অবহেলিত, নির্যাতিত জনগোষ্ঠীকে জ্বালাময়ী ভাষায় বিপ্লবী আহবান জানিয়েছেন। গণমানবশক্তিতে প্রত্যয়ী নজরুল জনগণকে দুর্বার সংগ্রামী হয়ে ওঠার আহবান জানান এ প্রবন্ধে। তাঁর বিপ্লবী আহবান-

"জাগো জনশক্তি! হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক, আমার মুটে-মজুর ভাইরা! তোমার হাতের এ-লাঙল আজ বলরাম-স্কন্ধে হলের মত ক্ষিপ্ত তেজে গগনের মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক, এই অত্যাচারীর বিশ্ব উপড়ে ফেলুক— উল্‌টে ফেলুক! আন তোমার হাতুড়ি, ভাঙ ঐ উৎপীড়কের প্রাসাদ— ধুলায় লুটাও অর্থ-পিশাচ বল- দর্পীর শির। ছোড়ো হাতুড়ি, চালাও লাঙল, উচ্চে তুলে ধর তোমার বুকের রক্ত-মাখা লালে-লাল ঝাণ্ডা! যারা তোমাদের পায়ের তলায় এনেছে, তাদের তোমরা পায়ের তলায় আন। সকল অহঙ্কার তাদের চোখের জলে ডুবাও। নামিয়ে নিয়ে এস ঝুঁটি ধ'রে ঐ অর্থ-পিশাচ যক্ষগুলোকে।"

নজরুল তাঁর অভিভাষণেও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার। 'কৃষক শ্রমিকের প্রতি সম্ভাষণ' শীর্ষক অভিভাষণে কৃষাণের আর শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার মানসিকতা প্রকাশিত। কৃষক-শ্রমিকের দুঃখ মোচনের জন্য তাদের মধ্য থেকেই সংগ্রামী মহাপুরুষের আগমন ঘটবে এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করে কবি নজরুল তাদেরকে কর্তব্য পালনের আহবান জানান। তাদের চেতনাকে জাগ্রত করার অভিপ্রায়ে নজরুল বলেন—

'হায় রে স্বার্থ! হায় রে লোভী দানবপ্রকৃতির মানব। আজ কৃষাণের দুঃখে শ্রমিকের কাৎরানিতে আল্লার আরশ কাঁপিয়া উঠিয়াছে। দিন আসিয়াছে, বহু যন্ত্রণা পাইয়াছ ভাই,— এইবার তাহার প্রতিকারের ফেরেশ্‌তা দেবতা আসিতেছেন। তোমাদের লাঙল, তোমাদের শাবল তাঁহার অস্ত্র, তোমাদের কুটির তাঁহার গৃহ। তোমাদের ছিন্ন মলিন বস্ত্র তাঁহার পতাকা। তোমরাই তাঁহার পিতামাতা। আমি আপনাদের মাঝে সেই অনাগত মহাপুরুষের শুভ আগমন প্রতীক্ষা করিয়া আপনাদের নব- জাগরণকে সালাম করিয়া নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি, ঐ বুঝি নব দিনমণির উদয় হইল!'

কবি নজরুল সমাজে শোষিত বঞ্চিত মানুষের রক্তস্নাত বাস্তবকে খুব কাছে থেকে অবলোকন করেছিলেন। তাঁর অন্তর বিগলিত হয়েছে তাদের বেদনায়। তাই শোষিত শ্রেণীর 'শান্তির অক্ষয় অধিকার' প্রতিষ্ঠার জন্য, দুর্বল-সবলের সমতাবিধান করার জন্য নজরুল বিপ্লবী ভাষায় কথা বলেন তাঁর সাহিত্যে।

তথ্যনির্দেশ

১। আতাউর রহমান, 'নজরুলঃ ঔপনিবেশিক সমাজে সংগ্রামী কবি', নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, আগস্ট, ১৯৯৩ পৃঃ ৯৭।

২। মীর আবুল হোসেন সম্পাদিত, 'নজরুল-সাহিত্য', ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, ১লা বৈশাখ, ১৩৭৭, পৃঃ ৯১।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

অমানবিক সমাজব্যবস্থা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর এদেশের শাসনভার ইংরেজদের হাতে চলে গেলে ভারতের জনগণের ভাগ্যে চরম দুর্ভোগ নেমে আসে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলা হয়। ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করে ভূমির মালিকানা ইংরেজরা নিয়ে নেয়। কৃষকদের নিঃস্ব করে স্থানীয় মহাজনদের দাসে পরিণত করা হয়। তার ওপর আবার নীলকরদের নীল চাষ ও নীলকরদের অত্যাচারে সাধারণ কৃষকদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। এদেশ থেকে অর্থ-সম্পদ নিয়মিত দেশের বাইরে পাচার করা হয়। কুটির শিল্পগুলো ধ্বংস করে ফেলায় বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়। ইংরেজ সরকারের বিমাতা সুলভ আচরণে এদেশে অর্থনৈতিক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি হয় বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার।

তাছাড়া সুদূর অতীতকাল থেকেই এদেশে রাজা, জোতদার, জমিদার প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর সাথে প্রজা ও সাধারণ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বৈষম্য ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল। অন্যদিকে এদেশ হিন্দু-মুসলমানসহ অন্যান্য ধর্মের মানুষের আবাস হওয়ার কারণে ধর্মীয় সমস্যাও ছিল। উদাহরণস্বরূপ ১৯২৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা উল্লেখ করা যায়। নজরুল প্রত্যক্ষ করেন ধর্মের নামে ভণ্ডামি, কূপমণ্ডুকতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এক অন্ধকার সমাজকে । তিনি সমাজের সর্বত্র নানারকম প্রগতিবিরোধী সামাজিক অনাচারের উপস্থিতি দেখতে পান। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার, অর্থনৈতিক শোষণ, নারীর প্রতি অন্যায়ের মত ঘৃণ্য সামাজিক অনাচারের কুৎসিত চেহারা নজরুল তাঁর চারপাশে প্রত্যক্ষ করেন।

মার্কিন কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের মত নজরুল আর্থিক দিক থেকে অসচ্ছল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং জীবিকার তাড়নায় নানা ধরণের কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হন। নজরুল হুইটম্যানের মতই আপামর জনসাধারণের বিশেষ করে সমাজের নিম্নবিত্তশ্রেণীর- নিকট-সংস্পর্শে আসেন। এর ফলে তিনি তাঁর সময়কার আর্থ-সামাজিক রূপ প্রত্যক্ষ করে ব্যথিত হন। নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষ হওয়ায়, অর্থ-বিত্ত, প্রভাব- প্রতিপত্তি না থাকায় নজরুল সমাজের সাধারণ মানুষের অতি কাছাকাছি যেতে পেরেছেন, প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন প্রচলিত সমাজের প্রকৃত চেহারাকে।

নজরুল জীবন আর জীবিকার প্রয়োজনে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে মিশেছেন। সেই সুবাদে সমাজের ক্ষতস্থানগুলোও দেখার সুযোগ পেয়েছেন।

কবি নজরুল স্থাণু, প্রথানুগ ও মনুষ্যবিদ্বেষী সমাজের প্রতিনিধি ছিলেন। যে সমাজে ধর্মবিশ্বাস মানুষের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও জীবনচর্যার পর্যায়ে না থেকে শোষণ ও ষড়যন্ত্রের শক্তিমান সমিধে রূপান্তরিত হয়, সে প্রতিবন্ধী সমাজের আভ্যন্তর বিকৃতি ও অসঙ্গতি উন্মোচন ও তা দূরীভূত করার প্রয়াস পেয়ে নজরুল তাঁর সমাজ পর্যবেক্ষণশক্তি ও তীক্ষ্ণ জাগর চৈতন্যের পরিচয় দিয়েছেন। 'নজরুল অন্যায় ও অসত্যভাবে প্রতিষ্ঠিত সকল রকমের সামাজিক ও ধর্মীয় অনাচার ও শোষণের কথাকে কবিতার উপাদান করেছেন। অর্থনৈতিক বৈষম্য যেমন সমাজে সৃজন করেছে ধনী-নির্ধন, খাতক- মহাজন, রাজা-প্রজা, কুলি-সাহেব,

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমিক-মালিক প্রভৃতি, তেমনই এই বৈষম্য থেকেই সামাজিক জীবনে নিম্ন পেশাজীবী ও অস্পৃশ্য শ্রেণীগুলোর সৃষ্টি হয়েছে।'[১] এই শ্রেণীর মানুষের ন্যায্য দাবির প্রশ্নে তাঁর তৎপরতা অব্যাহত ছিল। সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে ধর্মীয় কুসংস্কার ও কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে নর-নারী নির্বিশেষে অসহায় সবার প্রতি অবিচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে শাণিত তরবারির মত ঝল্‌সে উঠেছে কবির ক্ষুরধার লেখনী। এ প্রসঙ্গে সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথা উল্লেখ করা যায়। তাঁর মতে, "নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের জগতে ছন্দোময় এক দুরন্ত ঝটিকা-বেগ। ঝটিকার যা ধর্ম নজরুল ইসলামের কাব্য-প্রতিভার মধ্যে তার সব কিছুই বর্তমান।"[২]

প্রকৃতি জগতে দূরন্ত ঝটিকাবেগ যেমন সকল আবর্জনা-জীর্ণতা ও অসম্পূর্ণতাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে পরিবেশকে করে সুন্দর অনুরূপভাবে বিদ্রোহী কবির লেখনী দেশ ও জাতি গঠনের অন্তরায় সামাজিক কুসংস্কার, গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা, কূপমণ্ডুকতা, শোষণ ও অসাম্যের মূল উৎপাটন করে উন্নত মানব সমাজ গঠনের দেয় দিক নির্দেশনা।

অন্যান্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মতই নজরুলের আরেকটি লক্ষ্য ছিল সমাজ পরিবর্তনের। এ সমাজকে নিয়ে ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর প্রথম কাব্য 'অগ্নি-বীণা'র প্রথম কবিতা 'প্রলয়োল্লাস'-এ। মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন-

'১৯২১ সালের শেষাশেষিতে আমরা এদেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলব স্থির করেছিলাম। কাজী নজরুল ইসলামও আমাদের এই পরিকল্পনায় ছিল। রুশবিপ্লবের ওপরে যে সে আগে হতে শ্রদ্ধান্বিত ছিল সে কথা আমি আগেই বলেছি। আমাদের এই পরিকল্পনা হতেই সৃষ্টি হয়েছিল তার সুবিখ্যাত "প্রলয়োল্লাস" কবিতা। তার সিন্ধুপারের 'আগল ভাঙা' মানে রুশবিপ্লব। তার প্রলয় মানে 'বিপ্লব' আর জগৎজোড়া বিপ্লবের ভিতর দিয়েই আসছে নজরুলের নূতন অর্থাৎ আমাদের দেশের বিপ্লব। এই বিপ্লব আবার সামাজিক বিপ্লবও।'[৩]

'প্রলয়োল্লাস'-এ নজরুল ভয়ঙ্করকে আহবান জানিয়েছেন-

মৃত্যু- গহন অন্ধ- কূপে

মহাকালের চণ্ড- রূপে—

ধূম্র- ধূপে

বজ্র-শিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ঙ্কর —

(প্রলয়োল্লাস/ অগ্নি-বীণা)

সমাজে পরিবর্তন আনার জন্যে এমন 'ভয়ঙ্কর' কিছুরই প্রয়োজন। এ কবিতায় নজরুল "দেশবাসীকে বীর্যের ক্ষেত্রে, সত্যের সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার জন্যে ডেকেছেন। পুরোনোকে ভেঙ্গে তার স্থলে নতুনকে দেখতে চান— এটাই কবিতার মূল কথা।"[৪] কারণ নতুনেরাই পারে জরা-মৃত্যু, ব্যাধি, অসুন্দর আর অমঙ্গলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, বিপ্লব ঘটাতে।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল অত্যাচারিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত ও নির্জীব সমাজ- ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে চেয়েছেন। কেননা, যে সমাজে ম্যালথাসের থিওরির মত জ্যামিতিক হারে অনাচার, অবিচার আর নিপীড়ন বাড়ে এবং গাণিতিক হারে শুভ, কল্যাণ, ন্যায়বিচার আর বিবেক বৃদ্ধি পায়— সে সমাজ কখনো কাম্য সমাজ তথা সুশীল সমাজ হতে পারে না। সেটা অরাজক সমাজ হবসের স্ট্যাট অব নেচারের মত। এরূপ সমাজকে দান্তের নরকও বলা যেতে পারে। এ সমাজে যেমন সংস্কৃতিবান ও আলোকিত মানুষ বসবাস করতে পারে না— তেমনি জন্মলাভও করতে পারে না। এটা প্রকৃত অর্থেই জীবনানন্দ দাশের 'তিমির-বিলাসী' সমাজ। তাঁর 'অদ্ভুত আঁধার এক' কবিতায় এরূপ সমাজের চিত্র পাওয়া যায়—

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই- প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি,
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

নজরুলের সমাজও এর থেকে খুব একটা অভিন্ন নয়। তিনি প্রচলিত সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন কামনা করে তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশের প্রারম্ভেই উচ্চকণ্ঠে বিপ্লবী বাণী উচ্চারণের মধ্য দিয়ে—

মহা- বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন- রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,

(বিদ্রোহী/ অগ্নি-বীণা)

এখানে কবি দুর্বল, ভীত, শোষিত মানুষের পক্ষে ক্লীব সমাজ থেকে অন্যায়- অত্যাচারের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে শপথ গ্রহণের কথা বলেছেন। "গণশ্রেণীর উপর যুগে যুগে যে অবিচার অনুষ্ঠিত হইতেছে— যেভাবে স্বার্থান্বেষী ধনিক ও স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী তাহাদের রক্ত শোষিয়া লইতেছে যেভাবে তাহারা যুদ্ধের সময় শাসকগোষ্ঠীর কামানের খোরাক হইতেছে— তাহার প্রতিকার সাধনে কবি দৃঢ়- প্রতিজ্ঞ। কবি সুস্পষ্টভাবে গণশ্রেণীর পক্ষ হইয়া পৃথিবী হইতে অত্যাচারের উৎপীড়নের শেষ আশ্রয়টুকুর বিলুপ্তি সাধন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই অত্যাচার অবিচার বন্ধ হইলেই তাহার বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটিবে। তাহার পূর্বে তাঁহার বিশ্রাম নাই।"[৫]

Dhaka University Institutional Repository

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ধর্ম নিয়ে নানা ধরণের অমানবিক ক্রিয়া- কর্ম কবিকে ব্যথিত করেছে। তিনি সমাজে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কামনা করেছেন। নজরুল এমন এক সমাজ কামনা করেছেন, — যে সমাজে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ থাকবে না, হানাহানি থাকবেনা। ধর্ম নিয়ে গোঁড়ামি থেকে মানুষে মানুষে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটবে, সমাজে মানবতার চরম বিপর্যয় ঘটবে এটা নজরুল মেনে নিতে পারেননি। তাই ধর্মীয় ভেদাভেদমুক্ত সমাজ তাঁর কাম্য—

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছে জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া॥

(জাতের বজ্জাতি/বিষের বাঁশী)

ধর্মনিরপেক্ষ নজরুল প্রত্যক্ষ করেছেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কুসংস্কারের জটাজালে আকীর্ণতা। হিন্দু সমাজের ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কবি তীব্রভাবে আঘাত করে বলেছেন—

বল্‌তে পারিস্ বিশ্ব-পিতা ভগবানের কোন্ সে জাত?
কোন্ ছেলের তাঁর লাগ্‌লে ছোঁওয়া অশুচি হন জগন্নাথ?

(জাতের বজ্জাতি/বিষের বাঁশী)

কেবল হিন্দু নয়, মুসলমান সমাজের আত্মকেন্দ্রীক ধর্মাচরণের মধ্যেও নজরুল ভণ্ডামির চর্চা হতে দেখেছেন। স্বার্থপরভাবে লোকদেখানো ধর্ম-কর্ম করায় স্বার্থকতা নেই। নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখে বিত্তবান হওয়ার বদলে ত্যাগের মধ্য দিয়ে সুষম সমাজ গঠনের ওপর জোর দিয়েছেন তিনি—

নামাজ- রোজার শুধু ভড়ং,
ইয়া উয়া প'রে সেজেছ সং,
ত্যাগ নাই তোর এক ছিদাম!
কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কর জড়,
ত্যাগের বেলাতে জড়সড়!
তোর নামাজের কি আছে দাম?

(শহীদি-ঈদ/ভাঙার গান)

চৌদ্দ শতকের শেষের দিকের কবি চণ্ডীদাসও বলেছিলেন,-

সবার উপরে মানুষ সত্য;
তাহার উপরে নাই।

ইংরেজ কবি শেক্সপীয়রও হ্যামলেটের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন এভাবে- "What [a] piece of work is a man, how noble in reason, how infinite in faculties, in form and

Dhaka University Institutional Repository

moving, how express and admirable in action, how like an angel in apprehension, how like a god! the beauty of the world; the paragon of animals;"[৬]

মানুষকে সম্মানের সর্বোচ্চ আসনে বসাবার প্রয়াস নজরুলের মধ্যেও বর্তমান। নজরুল তাঁর সমাজব্যবস্থায় কাউকে পরম পূজনীয় বলে মাথায় তুলতে দেখেছেন, আবার কাউকে ঘৃণ্য বলে পায়ে ঠেলতে দেখেছেন, কাউকে উত্তম বলে গ্রহণ করতে আবার কাউকে অধম বলে বর্জন করতেও দেখেছেন। এ ধরণের কার্যকলাপ মানুষ ও তার আত্মাকে অপমান করারই নামান্তর। এতে মানবতার বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে মানবিক গুণাবলীর চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে জান্তব বৃত্তিগুলো। মানবতা আবদ্ধ হয়ে যায় এক অন্ধগলিতে। কবি তাই মানুষের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার অভিপ্রায়ে উচ্চারণ করেছেন শাশ্বত বাণী—

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্!

(মানুষ/সাম্যবাদী)

পৃথিবীকে 'পাপ-মুলুক' বলে অভিহিত করে নজরুল অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে,বিশ্বে নিষ্পাপ মানুষ তেমন কেউ নেই, সব মানুষই কম বেশি পাপ করেছে। অতএব সমাজে নিজে সাধু সেজে অপরকে পাপের জন্য অভিযুক্ত করাটা হবে অন্যায়। বিশেষ করে ধর্মান্ধরা সাধারণত এ কর্মটি করতে বেশি আগ্রহ দেখায়। ধর্মের নামে বিশেষ আবরণে নিজেকে আড়াল করে দোষমুক্ত সাজবার প্রচেষ্টা এবং অপরকে দোষী সাব্যস্ত করার পরিবর্তে নিজের মধ্যে প্রকৃত অর্থে সংশোধন আনতে হবে। কবির ভাষায়-

হেথা সবে সম পাপী

আপন পাপের বাট্‌খারা দিয়ে অন্যের পাপ মাপি।

... ...

পাপী নও যদি কেন এ ভড়ং ট্রেড্‌মার্কার ধুম্?

পুলিশী পোশাক পরিয়া হয়েছ পাপের আসামী গুম্!

(পাপ/সাম্যবাদী)

সমাজে নারীর মর্যাদাহীন অবস্থানকে নজরুল কোনভাবেই মেনে নিতে পারেননি। নারী পুরুষের মতই সমাজের একটা অপরিহার্য অংশ এবং তারাও মহৎ কোন কাজের কৃতিত্ব অর্জন করার ক্ষমতা রাখে। নজরুল প্রত্যক্ষ করেন সমাজ পুরুষের অপরাধ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখলেও নারীর অপরাধ ক্ষমা করে না । সমাজে নারীর এ করুণ অবস্থায় নজরুল মর্মাহত হন। পুরুষের অপরাধ ক্ষমাযোগ্য আর নারীর অপরাধ ক্ষমাহীন এটা নজরুল মানতে পারেননি। নারীত্বের অপমান আর পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ কবি প্রশ্ন তোলেন—

কয়জন পিতামাতা ইহাদের হয়ে নিষ্কাম ব্রতী

পুত্রকন্যা কামনা করিল? কয়জন সৎ-সতী?

Dhaka University Institutional Repository

ক'জন করিল তপস্যা ভাই সন্তান- লাভ তরে?

কারপাপে কোটি দুধের বাচ্চা আঁতুড়ে জ'ন্মে মরে?

(বারাঙ্গনা/সাম্যবাদী)

অতঃপর কবির সিদ্ধান্ত—

অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ -পুত্র হয়,

অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়।

(বারাঙ্গনা/ সাম্যবাদী)

পুরুষ শাসিত সমাজে নারীদের নির্যাতিত, অবহেলিত হতে দেখে নজরুল নারীর সম্মানজনক জীবনের পথের সন্ধান দিতে চেয়েছেন। নারীকে সমাজে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। নারী-পুরুষের সমান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে কবির দৃপ্ত কণ্ঠের উচ্চারণ—

সে-যুগ হয়েছে বাসি,

যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না ক', নারীরা আছিল দাসী।

(নারী/সাম্যবাদী)

নজরুল এমন একটা সমাজ কামনা করেছেন যেখানে রাজা- প্রজা, ধনী-নির্ধন, কালো আর সাদার ব্যবধান থাকবে না। ধর্মের পরিচয়ে বা অর্থ-বিত্তের যোগ্যতায় নয়, একজন মানুষ শুধু মানুষ হওয়ার কারণে সমাজে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকবে। ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী নির্বিশেষে সবার আন্তরিকতাপূর্ণ সহাবস্থানই তাঁর কাম্য-

নেই ক' এখানে ধর্মের ভেদ শাস্ত্রের কোলাহল,

পাদরী- পুরুত- মোল্লা- ভিক্ষু এক গ্লাসে খায় জল।

(সাম্য/সাম্যবাদী)

'কৃষাণের গান', 'শ্রমিকের গান', 'ধীবরদের গান' প্রভৃতি কবিতায় সাধারণ সর্বহারা কৃষক, শ্রমিক, জেলে,মুটে, মজুর সবাইকে কবি বিপ্লবী আহবান জানিয়েছেন অত্যাচারী শোষক শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য। শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার জন্য কবির বিপ্লবী আহবান—

আজ জাগ্ রে কৃষাণ, সব ত গেছে, কিসের বা আর ভয়,
এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।

(কৃষাণের গান/ সর্বহারা)

'শ্রমিকের গান'- এর বক্তব্যও একই চেতনার অভিব্যক্তি-

মোদের যা ছিল সব দিইছি ফুঁকে,

এইবারে শেষ কপাল ঠুকে

Dhaka University Institutional Repository

পড়ব রুখে অত্যাচারীর বুকে রে!

'ধীবরদের গান'- এর পংক্তি দুটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য—

কাটব অসুর এলে!
এবার উঠব রে সব ঠেলে॥

নজরুল পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় বিত্তবানদের হাতে জনগণের জিম্মিদশাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এখানে মহাজন ধনিক শ্রেণী নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য সাধারণ দরিদ্র মানুষের রক্ত শুষে নিতেও কার্পণ্য করে না। নিজেদের স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য নয়-কে ছয় এবং ছয়-কে নয় করতে তারা সিদ্ধহস্ত। কবির নিকট আশ্চর্য মনে হয়েছে যে, যারা ভূমি চাষ করে ফসল উৎপাদন করে ভূমির ওপর তাদের কোন অধিকার নেই। এ ব্যবস্থায় 'অবহেলিত উৎপাদক শ্রেণী' পদে পদে বঞ্চিত হচ্ছে। তারা উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত। উপরন্তু উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট না থেকেও একটা শ্রেণী উত্তরোত্তর আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছে এবং তারা সমাজে জমিদার নামে পরিচিত। সমাজে ধূর্ত ষড়যন্ত্রকারী, প্রতারকই আজ সুবিধাজনক অবস্থানে বসে আছে। এসব মহাজন, ভূগ্রাসী জমিদার ও ভণ্ডদের বিরুদ্ধে নজরুল ঈশ্বরের কাছে ফরিয়াদ করার মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ করেছেন। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার নীতিহীনতা ও অনাচারের বর্ণনা প্রদানের পাশাপাশি সামন্ততান্ত্রিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। কবির উক্তি—

জনগণে যারা জোঁক সম শোষে তারে মহাজন কয়,
সন্তান সম পালে যারা জমি তারা জমি-দার নয়।

(ফরিয়াদ/সর্বহারা)

নজরুল জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তন কামনা করেছেন। ধর্মনিরপেক্ষ নজরুলের পক্ষে কূপমণ্ডুক হওয়া সম্ভব হয়নি। তাই তিনি হিন্দু- মুসলমান নির্বিশেষে উভয় ধর্মের প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাকে সমাজ থেকে নির্বাসন দিয়ে ধর্মীয় বিভেদমুক্ত একটা সম্মিলিত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষকে সুন্দরের পথে মানবিকতার পথে আনতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁকে উভয় ধর্মের ধর্মান্ধ মানুষদের বিরাগভাজন হতে হয়েছে। তারা নজরুলের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছে। এমনকি স্বার্থসন্ধানী মুসলমান ধর্মগুরুরা তাঁকে 'কাফের' আখ্যা পর্যন্ত দিয়েছে। কেননা, এদেশে এক শ্রেণীর মৌলবী-মোল্লা তথা স্বার্থান্বেষীর দল একাট্টা হয়ে অর্থের বিনিময়ে ফতোয়া দিয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে আসছিল। দেশের মানুষ সচেতন হোক, সমাজে সুস্থ জীবনধারা প্রবাহিত হোক তারা তা চায়নি। কারণ এসব মানুষ সচেতন হলে তাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়া যাবে না। পরের পয়সায় জীবনযাপন ও খবরদারি করা ব্যাহত হবে। অতএব যারা ফতোয়ার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দেয়, সোচ্চার হয়, তারা 'মুরতাদ', 'কাফের' ও ধর্মচ্যুত। এসব ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে নজরুল দেশের মানুষকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর উক্তি—

মৌ-লোভী যত মৌলবী আর 'মোল্-লা'রা কন হাত নেড়ে',
'দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জা'ত মেরে!
ফতোয়া দিলাম-কাফের কাজী ও,
যদিও শহীদ হইতে রাজি ও!

(আমার কৈফিয়ত/ সর্বহারা)

Dhaka University Institutional Repository

বিপ্লবী কবি নজরুল আন্তরিকভাবে মানুষের দুঃখদুর্দশা, অপমান আর বঞ্চনার অবসান কামনা করেছেন। ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের সামান্যতম ভাবনাও তাঁর হৃদয়কে ভাবিত করেনি। দুখী মানবসমাজের মুক্তির চিন্তায়, বিচিত্র সমস্যায় জর্জরিত অমানবিক সমাজকে মানবিক সমাজে রূপান্তরিত করার অভিপ্রায়ে তাঁর সাহিত্য অভিযাত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। তাই তাঁর সাহিত্য বিপ্লবের বহ্নি বক্ষে ধারণ করল। সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ভাগ্য নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে সমাজের সে সব শত্রুদের বিরুদ্ধে আমৃত্যু সংগ্রাম অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করে কবি বলেন-

প্রার্থনা ক'রো- যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত -লেখায় তাদের সর্বনাশ!

(আমার কৈফিয়ত/ সর্বহারা)

জগতের ভাগ্যহত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য নজরুল বঞ্চিত শ্রেণীকে সংগ্রামী আহবান জানিয়েছেন, বিপ্লবের মন্ত্রে তাদেরকে উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছেন। বঞ্চিত মানুষের সুদিন আসার সম্ভাবনার কথা উচ্চারণ করেছেন। পুরনো ধ্যান- ধারণাকে সমাজের প্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করে নজরুল মান্ধাতার আমলের আচার-আচরণকে সমাজ থেকে দূরীভূত করতে ভাগ্যহত মানবশক্তির সংগ্রামস্পৃহাকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। 'সংগ্রামী চেতনা মানবসমাজের অন্তর্নিহিত সত্য' এবং এ চেতনাকে জাগিয়ে দেয়াই হচ্ছে প্রকৃত কাজ। কবি নজরুল তাই নিপীড়িত জনকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, জেগে ওঠার এইত সময়। কবির ভাষায়-

জাগো অনশন-বন্দী, ওঠ রে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত!
যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি'
হাঁকে নিপীড়িত- জন-মন- মথিত বাণী,
নব জনম লভি' অভিনব ধরণী
ওরে ওই আগত॥

আদি শৃঙ্খল সনাতন শাস্ত্র- আচার
মূল সর্বনাশের, এরে ভাঙিব এবার!

('অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত'/'ফণি-মনসা')

অন্যত্র বলেছেন,

ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম-মাঝ
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ!

('অন্তর- ন্যাশনাল সঙ্গীত'/ 'ফণি-মনসা')

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল প্রকৃত অর্থে নিজ সমাজের সংশোধন আনতে গিয়ে প্রকারান্তরে বিশ্ব সমাজের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন।

ধর্মগ্রন্থ মানুষের মুক্তির পথ দেখাবার জন্য রচিত। অথচ মুসলমান ধর্মের হাদিস, কোরআনের অপব্যাখ্যা দিয়ে একশ্রেণীর ধর্মান্ধ মোল্লা নিজেদের ব্যক্তিগত সুবিধা আদায় করে নিয়েছে। এসব ধর্ম ব্যবসায়ীরা কোরআনের বাণী অগ্রাহ্য করে নর-নারীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। পুরুষদেরকে নারীর যথাযথ অধিকার প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করতে উৎসাহিত করেছে। সঙ্গত কারণেই পুরুষ নারীরও যে একটা জীবন আছে, তাদেরও যে এ জগতে নিজেদের পছন্দ-অপছন্দ প্রকাশের অধিকার আছে তা মানতে নারাজ। কবি এই মনোভাবের পরিবর্তন আনতে চেয়ে বলেছেন—

বলে না কোরান, বলে না হাদিস, ইসলামী ইতিহাস,
নারী নর-দাসী, বন্দিনী র'বে হেরেমেতে বারোমাস!
হাদিস কোরান ফেকা ল'য়ে যারা করিছে ব্যবসাদারী,
মানে না ক' তা'রা কোরানের বাণী—সমান নর ও নারী।

('মিসেস্ এম্. রহমান'/ 'জিঞ্জীর')

নজরুল দেখেছেন জগত যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে আমাদের দেশের মুসলমান সমাজের মানুষ তখন তালাকের মত অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে উৎসাহ দেখাচ্ছে। যা কি-না সমাজের স্থিতিশীলতার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এতে সমাজে পারিবারিক জীবনে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয় এবং সুস্থ, সুন্দর, স্বাভাবিক জীবনের গতি ব্যাহত হয়। নজরুল তাই এ ধরণের কাজের বিরুদ্ধে মানুষের বিবেককে জাগাতে চেয়েছেন। তিনি বলেন-

বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখনো বসে
বিবি-তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি ফেকা ও হাদিস চ'ষে!

(খালেদ/জিঞ্জীর)

নজরুল মুসলিম দর্শন ইসলাম ও কোরআনের আদর্শ তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে পেয়েছেন। ভারতবর্ষে মুসলিম সমাজ ও তার বৈষম্য নজরুলকে ব্যথিত করে, ব্যথিত করে সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। তাই তাঁর মন এ সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লবী হয়ে ওঠে। ইসলামের প্রগতিশীলতা, সাম্যতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সর্বোপরি মানবতাবোধে উজ্জীবিত নজরুল। মানব সমাজের চির-কল্যাণের জন্য যে ইসলামী দর্শন তাকেই তিনি উচ্চকিত করতে চেয়েছেন। মানুষকে ব্যথার ডোরে না বেঁধে উদার মনোচিন্তায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তিনি তার ব্যাখ্যা করেছেন।

ঈদ মুসলমানদের একটা ধর্মীয় উৎসব। নজরুল এ ঈদ নিয়েও কবিতা রচনা করেছেন। এখানেও তিনি ত্যাগ ও সমাজের বঞ্চিতদের পাশে গিয়ে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার জন্য বিত্তবানদের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন-

Dhaka University Institutional Repository

ঈদ্- অল্- ফিতর আনিয়াছে তাই নববিধান,
ওগো সঞ্চয়ী, উদ্বৃত্ত যা করিবে দান,
ক্ষুধার অন্ন হোক তোমার।
ভোগের পেয়ালা উপ্‌চায়ে পড়ে তব হাতে,
তৃষ্ণাতুরের হিস্‌সা আছে ও পিয়ালাতে,
দিয়া ভোগ কর, বীর, দেদার॥

('ঈদ-মোবারক'/'জিঞ্জীর')

এদেশের মানুষ অতীতের গৌরবোজ্জ্বল দিনের পানে তাকিয়ে বর্তমানের করণীয় কাজকে ভুলে আছে। অতীতে আমাদের কোন্ বীরত্বপূর্ণ বা সমৃদ্ধ দিনের ঘটনা আছে তা স্মরণ করে বর্তমানকে নষ্ট করার প্রবণতা এদেশের মানুষের একটা স্বাভাবিক চরিত্র হয়ে দাঁড়ায়, একটা সংস্কারে পরিণত হয়। নজরুল এ কুসংস্কারের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে এ থেকে এদেশের মানুষকে প্রগতির পথে আনতে চেয়েছেন, স্থবির জীবনে গতি আনতে চেয়েছেন। কবির ভাষায়-

কবে আমাদের কোন্ সে পুরুষে ঘৃত খেয়েছিল কেহ,
আমাদের হাতে তারি বাস পাই, আজো করি অবলেহ!

('চিরঞ্জীব জগ্‌লুল'/'জিঞ্জীর')

নজরুল পুরনো সংস্কারকে ভুলে নতুন জগত সৃষ্টি করার জন্য তরুণ সমাজের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। কারণ তরুণরাই নতুন সৃষ্টিতে সক্ষম। পুরনো ধ্যান-ধারণার বিলোপ ঘটিয়ে নব সমাজ তথা কাম্য সমাজ গড়ে তোলার জন্য তরুণদের ডাক দিয়েছেন। কারণ তাদের সহযোগিতায় কবি পুরাতনকে পদদলিত করে, ভেঙ্গেচুরে ধ্বংস করে শান্তি ও মঙ্গল আনতে চাইলেন মানুষের সমাজে—

ভোল্ রে চির- পুরাতনের সনাতনের বোল্।
তরুণ তাপস! নতুন জগৎ সৃষ্টি ক'রে তোল্।
আদিম যুগের পুঁথির বাণী
আজো কি তুই চল্‌বি মানি'?

('তরুণ তাপস'/ 'সন্ধ্যা')

'সন্ধ্যা' কাব্যের 'যৌবন-জল-তরঙ্গ' কবিতায় কবি স্থবির রক্ষণশীল জীবনের প্রতীক পুরোহিতদের শকুনি রূপে অভিহিত করেছেন। এরা জীবনের জয়গানে মুখর নয়, বরং অনর্গল শাপ দেয়াই তাদের ধর্ম ও কর্ম। গলিত শবের ভাগাড়ে এরা মৃত্যুর স্তব করে। এরা জরা-মৃত্যুর বাহন এবং এসব নিষেধের প্রহরীদের কবি 'কাফের' বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ এরা তিলে তিলে মানুষের প্রাণ- রুধির শোষণ করে। স্থাণু,

Dhaka University Institutional Repository

গতিহীন জীবনের এ প্রতিনিধিদের কবি কোটরের জীব, প্যাঁচা ও খাঁচার বদ্ধ পাখি হিসেবে বিবেচনা করেছেন—

জিঞ্জির-পায়ে দাঁড়ে ব'সে টিয়া চানা খায়, গায় শিখানো বোল,
আকাশের পাখি। ঊর্ধ্বে উঠিয়া কণ্ঠে নতুন লহরী তোল্।

(যৌবন-জল-তরঙ্গ/সন্ধ্যা)

শেখানো বুলির প্রতি নজরুল ঘৃণা প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে প্রথাবদ্ধ জীবনাচরণকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। বৃদ্ধত্বের নয় গর্বোদ্ধত যৌবনের শাসনের জয়গানে নতুন জগত সৃষ্টির প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে কবিতায়—

যুগে যুগে ধরা করেছে শাসন গর্বোদ্ধত যে যৌবন-
মানে নি কখনো, আজো মানিবে না বৃদ্ধত্বের এই শাসন।
আমরা সৃজিব নতুন জগৎ আমরা গাহিব নতুন গান,
সম্ভ্রমে-নত এই ধরা নেবে অঞ্জলি পাতি' মোদের দান।

(যৌবন- জল- তরঙ্গ/ সন্ধ্যা)

সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে সমাজে সংস্কারের বোঝা পুঞ্জীভূত হয়ে ক্রমশঃ ভারী হয়ে উঠেছে। মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপনের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। সমাজের সেই অচলায়তনের নিগড় থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য নজরুল বিংশ শতাব্দীর নব-আলোকে সমাজকে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন-

সংস্কারের জগদ্দল পাষাণ
তুলিয়া বিশ্বে আমরা করেছি ত্রাণ।
সর্ব আচার-বিচার-পঙ্ক হ'তে
তুলিয়া জগতে এনেছি মুক্ত স্রোতে।
অচলায়তনে বাতায়ন খুলি'—প্রাণ
এনেছি, গেয়েছি নব-আলোকের গান।

(বিংশ শতাব্দী/ প্রলয়- শিখা)

বাল্য বিবাহ রোধ কল্পে মেয়েদের সম্মতির বয়স বাড়ানোর উদ্দেশ্যে যখন কল্যাণকামী 'সারদা আইন' বিল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপিত হয় তখন গোঁড়া ও রক্ষণশীলরা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। অথচ 'সারদা আইন' সমাজের হিতসাধনার্থ উত্থাপিত হয়। রক্ষণশীলদের এ গোঁড়ামির বিরুদ্ধে নজরুল বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেন-

Dhaka University Institutional Repository

ডুব্‌লো ফুটো ধর্ম-তরী,

ফাট্‌ল মাইন সর্দার।

উঠ্‌ল মাত্‌ম 'সামাল সামাল

ব- মাল মেয়ে - মর্দার॥

(সর্দা-বিল/চন্দ্রবিন্দু)

আইন অনুযায়ী মেয়েকে অধিক বয়সে বিয়ে দিতে হবে বলে-

দোক্তা ফেলে' গিন্নি কাঁদেন,

কর্তা চলেন হর্‌দ্বার॥

('সর্দা-বিল'/ 'চন্দ্রবিন্দু')

পৃথিবী যেখানে নতুন নতুন আবিষ্কারের নেশায় সামনের দিকে অগ্রসরমান এদেশের মানুষ সেখানে সুদূর অতীতের জীবনাচরণের ধারাবাহিকতা বজায় রাখাকে যেন ঐতিহ্যের লালন মনে করে। কবি বলেন-

আগাইয়া চলে নিত্য নূতন

সম্ভাবনার পথে জগৎ

ধুঁকে ধুঁকে চলে এরা ধরে সেই

বাবা আদমের আদিম পথ!

('জীবনে যাহারা বাঁচিল না'/ 'নির্ঝর')

সমাজের মানুষকে উন্নত জীবনের সন্ধান দেয়ার জন্য নজরুল নও জোয়ানদের আহবান জানিয়েছেন। মানুষকে তার আদিমতা পরিহার করে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে মানুষের মত মানুষ হয়ে বাঁচার চেতনা সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য নও জোয়ানদের ভূমিকা রাখতে ডাক দিয়েছেন। পুরনো আর জীর্ণ রীতি পদ্ধতিকে সমাজ থেকে নির্বাসন দিয়ে তার জায়গায় যুগোপযোগী, কল্যাণকর সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য যুব সমাজকে দায়িত্ব নিতে বলেছেন, পুরাতনের স্থলে 'নব-সমাজ' গড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন-

ওরে যৌবন-রাজার সেনানী

নয়া জমানার নও জোয়ান,

বনমানুষের গুহা হতে তোরা

নতুন প্রাণের বন্যা আন্‌!

যত পুরাতন সনাতন জরা-

জীর্ণরে ভাঙ্‌, ভাঙ্‌রে আজ!

আমরা সৃজিব আমাদের মত

করে আমাদের নব-সমাজ।

(জীবনে যাহারা বাঁচিল না / নির্ঝর)

Dhaka University Institutional Repository

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যও অন্যায়ের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সমাজকে ভাঙতে চেয়েছেন।

আজকে ভাঙার স্বপ্ন, — অন্যায়ের দম্ভকে ভাঙার,
বিপদ ধ্বংসেই মুক্তি, অন্য পথ দেখি নাকো আর।

('অনন্যোপায়'/'ঘুমনেই')

নজরুলের মতই সুকান্তের ভাঙার কাজের মধ্যে নব সমাজ গড়ার উদ্দেশ্য নিহিত।

জাতিকে খাদ্য সরবরাহ করেন কৃষক। অথচ সমাজে কৃষক চরমভাবে অবহেলিত। যাদের অমানবিক পরিশ্রমে উৎপাদিত ফসলে সমাজের মানুষের আহারের ব্যবস্থা হয় তারাই সমাজে অভুক্ত থেকে দিনাতিপাত করেন। অথচ সমাজ এ বিষয়ে নীরব। তাদের জীবনে আনন্দ নেই, দুর্বিষহ জীবন বয়ে বয়ে তারা ক্লান্ত। নজরুল কৃষকের প্রতি সমাজের এ উদাস মনোভাবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বিংশ শতাব্দীতে কার্ল মার্কস্ বলেছিলেন- "From each according to his capacity and to each according to his needs." অর্থাৎ যার যার ক্ষমতা অনুযায়ী প্রত্যেকে কাজ করবে এবং যার যার প্রয়োজন অনুযায়ী সামগ্রী পাবে। কিন্তু এ বক্তব্যের সাথে এদেশের কৃষকের অবস্থার মিল নেই। কার্ল মার্কসের এ বক্তব্যের পরে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাংলা ভাষায় কাব্যিক উচ্চারণ হিসেবে নজরুল ইসলামের এ কাব্যাংশটি স্মরণ করা যায়-

জীবনে যাদের হর্‌রোজ্ রোজা ক্ষুধায় আসে না নিদ
মুমূর্ষু সেই কৃষকের ঘরে এসেছে কি আজ ঈদ?

(কৃষকের ঈদ/নতুন চাঁদ)

কৃষক সমাজ সারা বছর অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটিয়ে ঈদের দিনে ঈদের প্রকৃত আনন্দ অনুভবের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। তাদের জীবনে ঈদের নিরন্তর আনন্দ-ধারা প্রবাহিত করিয়ে দেবার জন্য কবি সাধকের আবির্ভাব কামনা করেছেন-

কোথা সে মহান শক্তি-সাধক আনিবে যে পুন ঈদ?
ছিনিয়া আনিবে আসমান থেকে ঈদের চাঁদের হাসি,
ফুরাবে না কভু যে হাসি জীবনে, কখনো হবে না বাসি!

(কৃষকের ঈদ /নতুন চাঁদ)

কবি নজরুল নিজেকে 'বিপ্লবী হাওয়া' বলে পরিচয় দিয়েছেন। জেহাদ, বিপ্লব আর বিদ্রোহ তাঁর জীবনের ব্রত। তাঁর বিপ্লবী তৎপরতা সব রকমের পুরনো আর জীর্ণ সংস্কারের উচ্ছেদ সাধনে পরিচালিত। তাঁর ভাষায়-

পুরাতন আর জীর্ণ সংস্কারের আবর্জনা
দগ্ধ করিয়া চলি আমি উন্মাদ চির- উন্মনা।

(চির-নির্ভয়/ কবিতা ও গান)

Dhaka University Institutional Repository

সুকান্তও সমাজকে নির্বিঘ্ন করার প্রত্যয়ে উচ্চারণ করেছেন-

তাই তো তন্দ্রাকে ভাঙি, ভাঙি জীর্ণ সংস্কারের খিল,

('অনন্যোপায়'/ ঘুমনেই)

নজরুল এদেশের সমাজ থেকে সংস্কারের বোঝা সরিয়ে ফেলতে চেয়েছেন। কারণ সংস্কারই এদেশের সর্ব প্রকার অনগ্রসরতার কারণ। সমাজ তথা জাতি অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে প্রধানত বিভিন্ন রকমের সংস্কারের জালে আবদ্ধ থাকার কারণে। জাতির আলোকিত ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য নজরুল সমাজদেহ থেকে সংস্কারের বোঝা নামাতে চেয়েছেন, যাতে মানুষ মুক্ত ও কাম্য জীবনের অধিকারী হতে পারে। তাঁর ভাষায়—

সংস্কারের মিথ্যা বাঁধন

ছিন্ন হউক আগে,

তবে সে তোমার সকল দেউল

রাঙিবে আলোর রাগে।

(আশীর্বাদ/কবিতা ও গান)

কবিতার মত উপন্যাসেও প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও সংস্কারের প্রতি কবি নজরুলের বিপ্লবী মানসিকতার পরিচয় সুস্পষ্ট। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এদেশের সমাজ জীবনে প্রচলিত ধর্মীয় গোঁড়ামি, পর্দাপ্রথা, অবরোধ প্রথা, পীর প্রথা, রক্ষণশীলতা প্রভৃতি সামাজিক অনাচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অনেকেই কলম ধরেছিলেন। কিন্তু মুসলমান কবি-সহিত্যিকদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেনের পর একমাত্র কাজী নজরুল ইসলামই যথার্থ অর্থে বিপ্লবী বাণী উচ্চারণ করেন। তাঁর উপন্যাসের বিভিন্ন জায়গায় নারীর সামাজিক দুরবস্থার চিত্র ফুটিয়ে তুলে তার সমাধান আনার জন্য সমাজকে জাগাতে চেয়েছেন।

'বাঁধনহারা' উপন্যাসে মাহ্বুবা সোফিয়াকে উদ্দেশ্য করে যে পত্র লিখেছে তার দিকে দৃষ্টি দেয়া যাকঃ

'— পুরুষরাই ত আমাদের মধ্যে এইসব সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামি ঢুকিয়ে দিয়েচেন। এমন কেউ নেই আমাদের ভেতর যিনি এইসব পুরুষদের বুঝিয়ে দেবেন যে, আমরা অসূর্যম্পশ্যা বা হেরেম-জেলের বন্দিনী হলেও নিতান্ত চোর- দায়ে ধরা পড়ি নি। অন্তত পর্দার ভিতরেও একটু নড়ে চড়ে বেড়াবার দখল হতে খারিজ হয়ে যাই নি। আমাদেরও শরীর রক্ত-মাংসে গড়া; আমাদের অনুভব শক্তি, প্রাণ, আত্মা সব আছে। আর তা বিলকুল ভোঁতা হয়ে যায় নি। আজকাল অনেক যুবকই নাকি উচ্চশিক্ষা পাচ্চেন, কিন্তু আমি একে উচ্চ শিক্ষা না বলে লেখাপড়া শিখচেন বলাই বেশি সঙ্গত মনে করি। কেননা, এঁরা যত শিক্ষিত হচ্ছেন, ততই যেন আমাদের দিকে অবজ্ঞার হেকারতের দৃষ্টিতে দেখচেন, আমাদের মেয়ে জাতের ওপর দিন দিন তাঁদের রোখ চড়ে যাচ্চে। তাঁরা মহিষের মত গোঙানি আরম্ভ করে দিলেও কোন কসুর হয় না, কিন্তু দৈবাৎ যদি আমাদের

Dhaka University Institutional Repository

আওয়াজটা একটু বেমোলায়েম হয়ে অন্তঃপুরের প্রাচীর ডিঙিয়ে পড়ে, তাহলে তারা প্রচণ্ড হুঙ্কারে আমাদের চৌদ্দ পুরুষের উদ্ধার করেন। ওঁদের যে সাত খুন মাফ! হায়! কে বলে দেবে এদের যে, আমাদেরও স্বাধীনভাবে দুটো কথা বলবার ইচ্ছে হয় আর অধিকারও আছে, আমরাও ভালমন্দ বিচার করতে পারি।'

উপর্যুক্ত অংশে নজরুলের বৈপ্লবিক চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে বুঁচি অর্থাৎ লতিফা বেগমের কাছে লেখা পত্রে রুবি সংস্কারের বিরুদ্ধে যে কথা উচ্চারণ করেছে তা প্রকৃত অর্থে নজরুলেরই মনের কথা। সমাজে প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে রুবির মত একজন নারীকে প্রতিবাদী হিসেবে চিত্রিত করে নজরুল তাঁর বিপ্লবী চরিত্রের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। রুবি যখন বলে—

'তোরা পাহাড়ের মত সংস্কারের পর সংস্কারের পাথর চড়িয়ে উঁচু হয়ে আছিস্, তোরা হয়ত তাকেই বলিস্ মহিমা। কিন্তু ঐ মহিমার অচলায়তনে নিঃশ্বাস রোধ করে বেঁচে থাকার মায়া অন্তত আমার ছিল না কোনোদিন। ও জীবন আমার নয়।' তখন বিপ্লবী নজরুলকেই আমাদের স্মরণ হয়।

একই পত্রে রুবির মুখেই শোনা যায় সমাজের নির্মমতার কথা। সমাজেরই একরোখা নীতির কারণে একদিন রুবিকে তার অমতেই বিয়েতে রাজী হতে হয়েছিল। কিন্তু সে সমাজের বিচার- বিবেকহীন আচরণে ক্ষুব্ধ হলেও আত্মহত্যার মত ঘৃণ্য কাজ করে নিজেকে শেষ করে দেয়নি। সমাজের নির্মমতার বিরুদ্ধে জীবন্ত প্রতিবাদ হয়ে বেঁচে থেকেছে। রুবির কথায়-

'অবশ্য আত্মহত্যা করে নয়! এ ভীরুতা আমার মনে কোনো দিনই নেই। থাকলে অনেক আগেই মরতে পারতাম—অন্তত সেইদিন, যেদিন আমার অমতে আমাকে বিয়ের ছুরিতে গলা রাখতে হয়েছিল।'

এখানে রুবি চরিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে নজরুল সমাজের ভ্রান্ত নীতির পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন।

গল্পেও নজরুল সমাজকে নিয়ে ভেবেছেন। তাঁর 'রিক্তের বেদন' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'মেহের-নেগার' গল্পের প্রধান চরিত্র গুলশন্। বাইজীর মেয়ে—রূপজীবিনীর কন্যা হওয়ার কারণে সে প্রেমিকের অকৃত্রিম ভালবাসা গ্রহণ করতে না পেরে ত্যাগের মধ্য দিয়ে প্রেমের পবিত্রতা রক্ষা করতে ও প্রেমের সার্থকতা অর্জন করতে চায়। ফলে প্রেমাস্পদের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে এবং সে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেয়। তার কবরের শিয়রে উৎকীর্ণ থাকে বেদনাময় অনুরোধ-

'অপবিত্র জঠরে জন্ম নিলেও ওগো পথিক, আমায় ঘৃণা করো না! একবিন্দু অশ্রু ফেলো, আমার কল্যাণ কামনা ক'রে—আমি অপবিত্র কি- না জানি না, কিন্তু পবিত্র ভালোবাসা আমার এই বুকে তার পরশ দিয়েছিল।'

গুলশন্ -এর এ করুণ পরিণতির জন্য দায়ী তার সমাজ ও সমাজের সংকীর্ণ অনুদার মনোভাব। সামাজিক সংস্কার উদ্ভূত জন্ম যন্ত্রণার কারণেই গুলশন্-এর জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। 'বারাঙ্গনা' কবিতার ন্যায়'মেহের-নেগার' গল্পে নজরুলের বিপ্লবী চেতনা উচ্চগ্রামে অবস্থান না নিলেও এতে যে বিপ্লবের প্রকাশ ঘটেছে তা অনায়াসে বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধেও নজরুল সমাজব্যবস্থার অমানবিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার। নজরুল মানবতার ধর্মে বিশ্বাস করেছেন। ধর্মের নামে সমাজে অনাচার অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদা সোচ্চার থেকেছেন। ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজে ছুঁৎমার্গরূপ কুষ্ঠরোগ-এর উপস্থিতিতে বিভিন্ন রকম অন্যায় হতে দেখে তিনি ব্যথিত হয়েছেন, ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ছুঁৎমার্গ বিধির কারণেই হিন্দু সমাজে মানুষ কুকুরের চেয়েও ঘৃণ্য প্রতিপন্ন হত— যা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং মনুষ্যত্বের চরম অপমান। নজরুল ভীষণ লজ্জাকর এ সামাজিক ব্যাধিকে মানুষের প্রকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায় বলে জেনেছেন এবং সমাজ থেকে তার মূল উৎপাটন করার জন্য নবীনদের "আয়রে নবীন, আয়রে আমার কাঁচা!" বলে ডাক দিয়েছেন। 'যুগবাণী' প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্গত 'ছুঁৎমার্গ' প্রবন্ধে নজরুল নিজের ধর্মকে মেনে নিয়ে সবাইকে প্রাণ হতে দু' হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করার শক্তি অর্জন করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কেননা,

"যত ছোঁয়া-ছুঁয়ির নীচ ব্যবহার ভণ্ড বক-ধার্মিক আর বিড়াল-তপস্বী দলের মধ্যেই। ইহাদের এই মিথ্যা মুখোশ খুলিয়া ফেলিয়া ইহাদের অন্তরের বীভৎস নগ্নতা সমাজের চোখের সম্মুখে খুলিয়া ধরিতে হইবে।"

নজরুলের মতে হৃদয়ের শুদ্ধতা আনতে পারলেই সমাজের পরিশুদ্ধি আসবে। নজরুলের আশাবাদও তাই। তিনি দেখিয়েছেন ভারতকে একটা অখণ্ড জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে হলে সমাজ থেকে সর্ব প্রকার বাধাবিঘ্ন অপসারিত করতে হবে। সেজন্য তরুণ সমাজকে সাথে নিয়ে একযোগে কাজ করতে হবে। এখানে রক্ষণশীলতার এতটুকু স্থান নেই। নজরুলের ধর্ম নির্বিশেষে সর্ব মানবের প্রতি উদাত্ত আহবান—

"এসো, যদি পার, তোমার স্বধর্মে প্রাণ হইতে নিষ্ঠা রাখিয়া আকাশের মত উদার অসীম প্রাণ লইয়া এসো। এসো তোমার সমস্ত সামাজিক বাধাবিঘ্ন দু'পায়ে দলিয়া মানুষের মত উচ্চ শিরে তোমার মুক্তবিথার নাঙ্গা মনুষ্যত্ব লইয়া। এসো, মানুষের বিরাট বিপুল বক্ষ লইয়া। সে মহা-আহবানে দেখিবে আমরা হিন্দু-মুসলমান ভুলিয়া যাইব। আমাদের এই তরুণের দল লইয়া আমরা আজ কালাপাহাড়ের দল সৃষ্টি করিব।"

আবহমান কাল ধরে এদেশের সমাজে 'ছোটলোক' বলে মানুষকে হেয় করার প্রবণতা অব্যাহত। নজরুল এমন প্রবণতাকে গ্রহণ করতে পারেননি। মানুষকে ছোটলোক বলে ঘৃণা করার কোন অধিকার বিত্তবানদের নেই। বিত্তবান আর বিত্তহীনদের মধ্যে অর্থাৎ ছোটলোকদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সবাই একই মহা-আত্মার অংশ। 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে নজরুলের উচ্চারণ-

'আমাদের এই পতিত, চণ্ডাল, ছোটলোক ভাইদের বুকে করিয়া তাহাদিগকে আপন করিয়া লইতে, তাহাদেরই মত দীন বসন পরিয়া, তাহাদের প্রাণে তোমারও প্রাণ সংযোগ করিয়া উচ্চ শিরে ভারতের বুকে আসিয়া দাঁড়াও, দেখিবে বিশ্ব তোমাকে নমস্কার করিবে।'

সমাজে মানুষের মধ্যে উত্তম-অধম অর্থাৎ কেউ অভিজাত এবং কেউ অধম ব্রাত্য, কেউ অত্যন্ত সম্মানিত আবার কেউ চরম ঘৃণ্য এমন প্রচলিত সংস্কার বা বোধকে নজরুল অস্বীকার করেছেন। মানুষের সমাজিক অবস্থান কিংবা জন্ম পরিচয়কে নজরুল মোটেও বড় করে দেখেননি। তিনি মানুষকে কর্মের মাপকাঠিতে বিচার করেছেন, মানুষকে সমাজে তার প্রাপ্য সম্মানের অধিকারী দেখতে চেয়েছেন। মানুষের সামাজিক কিংবা পেশাগত পরিচয়কে প্রাধান্য দিয়ে সমাজে যে উঁচু-নীচুর শ্রেণীকরণ করা হয়েছে নজরুল তা

Dhaka University Institutional Repository

ভেঙে দিয়ে ভেদাভেদ মুক্ত সমাজ গড়তে চেয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে নজরুল 'বাঙালির ব্যবসাদারী' প্রবন্ধে দিক নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন—

'সমাজ বা জন্ম লইয়া এই যে বিশ্রী উঁচু-নীচু ভাব, তাহা আমাদিগকে জোর করিয়া ভাঙিয়া দিতে হইবে। আমরা মানুষকে বিচার করিব মনুষ্যত্বের দিক দিয়া, পুরুষকারের দিক দিয়া। এই বিশ্ব-মানবতার যুগে যিনি এমনই করিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন, তাঁহাকে আমরা বুক বাড়াইয়া দিতেছি— তাঁহাকে নমস্কার করি।'

এদেশের সমাজে মানুষের মধ্যে একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, জীবনে একটা চাকরি জোটাতে পারলেই জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া গেল। বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজে এ ধারণা প্রবল ছিল এবং তারা লেখাপড়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য হিসেবে চাকরি প্রাপ্তিকেই বুঝত। মোটকথা বিষয়টা জনসমাজে একটা সংস্কারে পরিণত হয়েছিল। নজরুল এ অন্ধ ভ্রান্ত ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করেন। তিনি মানুষের মধ্যে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত চাকরি প্রাপ্তির এ মানসিকতাকে দাসত্ব হিসেবে মনে করেন এবং এ চাকরি করাটাকে এদেশের পরাধীনতার একটা অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি চাকরির মোহ ত্যাগ করার জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াস পান। 'আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন?' প্রবন্ধে তিনি বলেন-

"কেন ভণ্ডামি, অসত্য, ভীরুতা, আমাদের পেশা হইয়া পড়িয়াছে? কেন আমরা কাপুরুষের মত এমন দাঁড়াইয়া মার খাই? ইহার মূলে ঐ এক কথা, আমরা অধীন—আমরা চাকরিজীবী। দেখাইতে পার কি, কোন জাতি চাকরি করিয়া বড় হইয়াছে? আমরা দশ-পনর টাকার বিনিময়ে মনুষ্যত্ব, স্বাধীনতা অনায়াসে প্রভুর পায়ে বিকাইয়া দিব, তবু ব্যবসা-বাণিজ্যে হাত দিব না, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিব না। এই জঘন্য দাসত্বই আমাদিগকে এমন ছোট হীন করিয়া তুলিতেছে।'

পরের ওপর নির্ভরশীলতা উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক। পরনির্ভরতাকে এদেশের মানুষের স্বভাবে পরিণত হতে দেখে নজরুল কথা বলে ওঠেন। পরের ওপর নির্ভরশীলতাকে নজরুল গোলামি বলে আখ্যায়িত করেন। নিজের দায়িত্ব অন্যে সম্পাদন করে দেবে এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে এদেশের মানুষ সব দিক থেকে পরাধীন হয়ে রয়েছে। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পেতে হলে পরনির্ভরতার অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে। দেশমাতৃকার মুক্তির প্রসঙ্গ তো আছেই। 'রুদ্র-মঙ্গল' প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্গত 'আমার পথ' প্রবন্ধে নজরুল লিখেছেন -

"এই পরাবলম্বনই আমাদের নিষ্ক্রিয় ক'রে ফেললে। একেই বলে সবচেয়ে বড় দাসত্ব। অন্তরে যাদের এত গোলামির ভাব, তারা বাইরের গোলামি থেকে রেহাই পাবে কি ক'রে? আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে। এই আত্মনির্ভরতা যেদিন সত্যি সত্যিই আমাদের আসবে, সেই দিনই আমরা স্বাধীন হব, তার আগে কিছুতেই নয়।"

অভিভাষণে নজরুল সমাজের অমানবিকতাকে, কুসংস্কারকে আক্রমণ করেছেন। তিনি ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ও ৬ই নভেম্বর সিরাজগঞ্জের নাট্যভবনে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের সভাপতি-রূপে 'তরুণের সাধনা' শীর্ষক অভিভাষণ প্রদান কালে বলেন-

Dhaka University Institutional Repository

'আমাদের বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে যে গোঁড়ামি, যে কুসংস্কার, তাহা পৃথিবীর আর কোনো দেশে, কোনো মুসলমানের মধ্যে নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। আমাদের সমাজের কল্যাণকামী যে সব মৌলানা সাহেবান খাল কাটিয়া বেনো-জল আনিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি ভবিষ্যৎদর্শী হইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন— বেনো-জলের সাথে সাথে ঘরের পুকুরের জলও সব বাহির হইয়া গিয়াছে। উপরন্তু সেই খাল বাহিয়া কুসংস্কারের অজস্র কুমির আসিয়া ভিড় করিয়াছে। মৌলানা মৌলবী সাহেবকে সওয়া যায়, মোল্লাও চক্ষুকর্ণ বুঁজিয়া সহিতে পারি, কিন্তু কাঠমোল্লার অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।'

ফতোয়াবাজ কাঠমোল্লাদের অপকর্মের হাত থেকে সমাজ তথা সমাজের মানুষকে কেবল তরুণ সমাজই রক্ষা করতে পারে বলে অভিমত প্রকাশ করে নজরুল বলেন-

'ইহাদের ফতুয়া-ভরা ফতোয়া! বিবি তালাক ও কুফরির ফতোয়া ত ইহাদের জাম্বিল হাতড়াইলে দুই দশ গণ্ডা পাওয়া যাইবে। এই ফতুয়া-ধারী ফতোয়া-বাজদের হাত হইতে গরিবদের বাঁচাইতে যদি কেহ পারে ত সে তরুণ।'

চিঠিপত্রেও সমাজের অমানবিকতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নজরুলের কবিকণ্ঠ সোচ্চার। ১৩৩৪ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'নওরোজ' পত্রিকায় অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁর একটি পত্র ছাপা হয় নজরুলকে উদ্দেশ্য করে। সে পত্রে লেখক নজরুলকে উদ্দেশ্য করে কতগুলো প্রশ্ন করেন। কবি নজরুল তার উত্তরে একই বৎসর 'সওগাত' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় একটি চিঠি দেন। এই চিঠিতে নজরুলের সমাজ-ভাবনা সহ তাঁর বিপ্লবী সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। নজরুল লেখনী দিয়ে সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখেছেন। তৎকালীন পরাধীন, ঘুণেধরা কুসংস্কার আর অচলায়তনের সমাজকে সুস্থ ও স্বাধীন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে নজরুল বলেন—

'আপনি সমাজকে "পতিত, দয়ার পাত্র" বলেছেন। আমিও সমাজকে পতিত demoralized মনে করি — কিন্তু দয়ার পাত্র মনে করতে পারিনে। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি আমার সমাজকে মনে করি ভয়ের পাত্র। এ-সমাজ সর্বদাই আছে লাঠি উঁচিয়ে; এর দোষ-ত্রুটির আলোচনা করতে গেলে নিজের মাথা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। আপনি হয়ত হাসছেন, কিন্তু আমি ত জানি, আমার শির লক্ষ্য করে কত ইট-পাটকেলই না নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

আমার কি মনে হয় জানেন? স্নেহের হাত বুলিয়ে এ পচা সমাজের কিছু ভাল করা যাবে না। যদি সে রকম 'সাইকিক-কিওর'- এর শক্তি কারুর থাকে, তিনি হাত বুলিয়ে দেখতে পারেন। ফোঁড়া যখন পেকে পচে ওঠে তখন রোগী সবচেয়ে ভয় করে অস্ত্র-চিকিৎসককে। হাতুড়ে ডাক্তার হয়ত তখনো আশ্বাস দিতে পারে যে, সে হাত বুলিয়ে ঐ গলিত ঘা সারিয়ে দেবে এবং তা শুনে রোগীরও খুশি হয়ে উঠবার কথা। কিন্তু বেচারি 'অবিশ্বাসী' অস্ত্র চিকিৎসক তা বিশ্বাস করে না। সে বেশ করে তার ধারালো ছুরি চালোয় সে-ঘায়ে; রোগী চেঁচায়, হাত পা ছোঁড়ে, গালি দেয়। সার্জন তার কর্তব্য করে যায়। কারণ সে জানে, আজ রোগী গালি দিচ্ছে, দু'দিন পরে ঘা সেরে গেলে সে নিজে গিয়ে তার বন্দনা করে আস্‌বে।'

যুক্তিসঙ্গত কারণেই নজরুল একই পত্রের অন্যত্র বলেছেন- 'এ কুম্ভকর্ণ-মার্কা সমাজকে জাগাতে হলে আঘাত দিয়েই জাগাতে হবে।'

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, নজরুল সমাজ তথা সমাজের মানুষের মধ্য থেকে অক্রিয়তা, অচৈতন্য, মোহ, জড়তা, কুসংস্কার প্রভৃতি কাটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। সমাজকে সংকীর্ণতা থেকে উন্মুক্ত পরিসরে নিয়ে আসতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদিন যে সংকীর্ণ পরিবেশ থেকে "কোথায় যদি ছুটিতে পাই বাঁচিয়া যাই তবে" (মানসী)[৭] বলে মনের ভাব প্রকাশ করেছিলেন, নজরুল সেই সংকীর্ণতার বেড়াজাল ছিন্ন করে নিজে বাঁচলেন এবং সমাজের অপরাপর মানুষকে বাঁচাবার জন্য পথের সন্ধান দিলেন।

নজরুল সমাজের অসঙ্গতিকে তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরে তার সমাধানের পথও নির্দেশ করেছেন। ইসলাম ধর্মের অনুসারী নজরুল জাতীয়তায় বাঙালি হওয়ায় তাঁর লেখনী বাঙালি হিন্দু- মুসলমান উভয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন এদেশের হিন্দু-মুসলমান দুটো পৃথক ধর্মের অনুসারী হলেও তারা মূলতঃ একই ভারত-মাতার সন্তান। তাই তিনি সমাজে উভয় ধর্মের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কামনা করেছেন। কেননা জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুক্তি আনতে হলে সম্মিলিত প্রয়াস দরকার আর তার সূত্রপাত সমাজ থেকেই ঘটবে। এক্ষেত্রে নজরুল বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত অসাধ্যের সাধক তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। 'তরুণ যুবসমাজ অসাধ্য সাধনে সক্ষম' এটা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বলা বাহুল্য, সমাজ পরিবর্তনও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। নজরুল তাই তাদের ওপর অসামান্য ভরসা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেছেন সমাজ সংস্কারের কাজ, সমাজে পরিবর্তন কিংবা পরিবর্ধনের কাজ তরুণদের, যুবকদের দ্বারাই বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব। তাই নজরুল তরুণ ও যুবক সমাজকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন জীয়ন্ -কাঠির স্পর্শে।

জাতি হিসেবে অগ্রগতি অর্জন করার উপায় স্বরূপ নজরুল সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণের ওপর জোর দিয়েছেন। সমাজের মানুষকে সত্য-সুন্দর- শুভের চর্চা ও অনুশীলনের তাগিদ দিয়েছেন। অশান্ত অতৃপ্ত পারস্পরিক বিদ্বেষে অন্ধ, হিংসায় উন্মত্ত মানুষকে তাদের নিজ নিজ স্বার্থেই উদ্বুদ্ধ হবার বিপ্লবী আহবান জানিয়েছেন যাতে সমাজের প্রতিটি মানুষ তার আপন সংকীর্ণ স্বার্থকে যুক্ত করতে পারে ব্যাপক মানবকল্যাণের সঙ্গে। নজরুল মানুষের মনে প্রেমানুভূতির উদ্বোধন ঘটাতে চেয়েছেন, সমাজ থেকে ঠকবাজি হতাশা অনাস্থা হানাহানিসহ সব রকম অন্যায়- অশুভের অবসান ঘটাতে চেয়েছেন, সার্বজনীন ঐক্য ও অনাবিল প্রেমের ভিত্তিতে নিখিল বিশ্বের মানুষের জন্য এক নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। আহমদ ছফা লিখেছেন-

'তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা কবিতার ভারকেন্দ্রের পালাবদল ঘটে- কবিতা গজদন্ত মিনার ছেড়ে রাজপথে নেমে এলো এবং সামাজিক শক্তির অংশ হিসেবে স্বরূপ প্রকাশ করলো। সমাজের নির্যাতিত মানুষেরা কবিতায় স্বীকৃতি পেলো, কাজী নজরুলের কবিতা তাঁদের ভাগ্যলিপি হয়ে দেখা দিলো।'[৮]

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮২ সালে প্রকাশিত তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় 'সমাজ বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র।' বলে যে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন নজরুল তার বিপরীতে সমাজে বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছেন অশুভকে নাশ করে শুভ-র প্রতিষ্ঠা -লক্ষ্যে এবং এ বিপ্লবের প্রয়োজনকে প্রসারিত করেছেন ভবিষ্যতের নবযুগের মধ্যে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. অনীক মাহমুদ, 'আধুনিক বাংলা কাব্যে সাম্যবাদী চেতনা'

[১৯২০-১৯৪৭], বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯৫, পৃ: ৯৬।

২. প্রেমেন্দ্র মিত্র, 'ভূমিকা', শেষ সওগাত',আবদুল কাদির-সম্পাদিত নজরুল- রচনাবলী, ৩য় খন্ড, পৃ: ২৯১।

৩. মুজফ্ফর আহমদ, 'কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা', মুক্তধারা, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ পৃ: ১০৭।

৪. জি.এম. হালিম, 'নজরুল কাব্যে গণচেতনা', পৃ: ২৫।

৫. জি.এম. হালিম, 'নজরুল মানস সমীক্ষা', পৃ: ৯৩-৯৪।

৬. William Shakespeare, 'HAMLET', Edited by Susanne L. Wofford, Bedford Books of St. Martin's Press, Boston, New York. Page-70.

৭. আনিসুজ্জামান, 'নজরুল ইসলাম ও তাঁর কবিতা', বই- 'নজরুল ইসলাম: নানা প্রসঙ্গ' সম্পাদক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, জুন, ১৯৯১, পৃ: ১৭৩।

৮. আহমদ ছফা, আহমদ ছফার প্রবন্ধ, ঢাকা ১৩৯৯/১৯৯৩ পৃ: ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাবকাল নিরুত্তাপ ছিল না। রাজনৈতিক উত্তাল সময়ে অস্থিরতার মধ্যে বেড়ে ওঠা বিপ্লবী পুরুষ কবি নজরুল ইসলাম। তাঁর রচনায় সময়ের অবশ্যম্ভাবী ছাপ সুস্পষ্টভাবেই পড়েছে। তাঁর শৈশব-কৈশোরের পটভূমি, বিপ্লবী ও আদর্শবাদী দেশ নেতার সঙ্গে সম্পর্কের কারণে তাঁর সাহিত্য বিপ্লবী মর্যাদা লাভ করবে এটাই স্বাভাবিক।

ব্রিটিশ শাসিত অবিভক্ত ভারতবর্ষে নজরুল একাধারে ছিলেন কবি ও রাজনৈতিক সংগ্রামী। সে সময়ের রাজনৈতিক সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন। বিপ্লবী কবি নজরুল তাঁর সাহিত্যকে ব্রিটিশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছেন সার্থকভাবে। সঙ্গত কারণেই তাঁর সাহিত্যকে 'প্রতিরোধের সাহিত্য' বা ইংরেজিতে 'Resistance Literature' বলা যায়। কেননা, তিনি উপনিবেশের সুখী সুন্দর নন্দনতত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করে শিল্পকে নান্দনিকতার কল্পলোকের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করেছেন। 'শিল্পের জন্য শিল্প'-এই ধারণার বশবর্তীদের দ্বারা শিল্প ও জীবনের মাঝখানে যে দেয়াল গড়ে ওঠে নজরুল তাঁর বিপ্লবী বাণীর শাণিত আঘাতে সে দেয়াল ভেঙ্গে চুরমার করে শিল্প ও জীবনের মহামিলন ঘটিয়েছেন।

১৯১৯ সাল থেকে ১৯৪১-৪২ সাল পর্যন্ত নজরুলের সাহিত্য রচনার কাল। ভারতের মুক্তি আন্দোলনের বিপ্লবী আদর্শের প্রতি তাঁর দ্বিধাহীন সমর্থন ছিল। বিপ্লবী নেতা বারীন্দ্র কুমার ঘোষের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নি-বীণা' উৎসর্গ করেন। বাঘা যতীনকে স্মরণ করে তিনি নির্ভয়ে 'নব ভারতের হলদিঘাট' নামে কবিতা রচনা করেন। কারাগারে অনশনে জীবন উৎসর্গকারী যতীন দাসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন সহ পূর্ণচন্দ্র দাস, পুলিন দাস, গোপীনাথ সাহা প্রমুখ বিপ্লবীদের তিনি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। ক্ষুদিরামকে তিনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদের মর্যাদা দেন। রবীন্দ্রনাথও এঁদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি বিরূপ ছিলেন। প্রমাণ হিসেবে 'ঘরে-বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের নাম উল্লেখ করা যায়। নজরুল বিপ্লবকে স্বাগত জানাতে গিয়ে দেশের ও বিদেশের যে সমস্ত বীর ও বিপ্লবী মানুষের স্বাধীনতার জন্য, মুক্তির জন্য ত্যাগের পথে এসে হাসিমুখে নির্যাতন সহ্য করেছেন তাঁদেরও তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। বর্তমানকে পুনর্নির্মাণের হাতিয়ার হিসেবে নজরুল গৌরবময় অতীতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। নজরুল তাঁর বৈপ্লবিক চেতনাকে বাস্তব রূপ দেয়ার অভিপ্রায়ে পশ্চিম এশিয় ইতিহাস এবং ভারতীয় ঐতিহ্যলোকে শক্তির উৎস সন্ধান করেছেন। ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য, ধর্মকে পুঁজি করে স্বার্থসিদ্ধির পথ বন্ধ করার জন্য এবং সর্ব প্রকার অসত্য- অমঙ্গল - অসংগতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যই মূলতঃ তাঁর এ শক্তি-সঞ্চয় কার্যক্রম চলে।

ভারতবর্ষের মানুষের অবরুদ্ধ চেতনাকে জাগ্রত করার অভিপ্রায়ে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সাহিত্য সাধনায় রত ছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান কামনায়, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিবাদী জীবনাকাঙ্ক্ষায়, ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সর্বমানবের মুক্তির বাসনায় নজরুল তাঁর সাহিত্যকে গণ-আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত করেন। নজরুল সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে নবজাগরণ ঘটাতে চেয়েছেন। যার মাধ্যমে পরাধীনতা থেকে দেশের মুক্তি আসবে, নারীর অধিকার অর্জিত হবে, শোষণ প্রক্রিয়াসহ সমাজ থেকে যাবতীয় কুসংস্কারের বিলুপ্তি ঘটবে। অমানবিক সমাজ পরিণত হবে সুশীল সমাজে। নজরুলের রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

চেতনা ও বিশ্বাস থেকেই বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে বিপ্লবী বাণী উচ্চারিত হয়েছে। জাতীয় মানসকে বিপ্লবের পথে চালিত করার মানসিকতাই তাঁকে অনবরত বিপ্লবাত্মক ভাবের সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। নজরুলের হাতেই প্রথম বাংলা সাহিত্য সচেতন রাজনৈতিক মেজাজ লাভ করে। তাঁর পূর্ববর্তী বিপ্লবী কবি মধুসূদনও পরাধীন দেশের অধিবাসী ছিলেন। তিনি পরাধীনতার গ্লানিবোধ এবং স্বাধীনতার জন্য প্রাণের আকুতি প্রকাশ করতে গিয়ে রাবণকে সৃষ্টি করেন। অসঙ্কোচ ও অনবদ্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে মধুসূদন যে চেতনার প্রকাশ ঘটান পরবর্তীকালে কবি হেমচন্দ্রের মধ্যেও তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাঁকেও ইংরেজের রোষানলে পড়তে হয়। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অহিংস আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি গান্ধীজীর ব্যক্তিগত চরিত্র ও অহিংস মতের প্রতি গভীরভাবে আস্থাবান ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের চেয়ে নজরুলের রাজনৈতিক দৃষ্টি অনেক স্বচ্ছ থাকার কারণে প্রথমে তিনি অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন দিলেও এ আন্দোলনের ব্যর্থতা অনুধাবন করে সশস্ত্র সংগ্রামকে স্বাগত জানান। কবি সুকান্তের কবিতায়ও বিপ্লবী চেতনার উপাদান সামান্য নয়। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ব্রিটিশ রাজত্বে নজরুলের যতগুলো বই বাজেয়াপ্ত হয়েছে, যতগুলো বই প্রায় বাজেয়াপ্ত অবস্থায় রাজরোষ থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে,সে রকম আর অপর কোন বাঙালি সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে ঘটেনি। বাঙালি সাহিত্যিকদের মধ্যে কেবল রচনার কারণে নজরুল ছাড়া অন্য কাউকে নিয়েই ঔপনিবেশিক সরকারের গোয়েন্দা বিভাগকে এতবেশী মাথা ঘামাতে হয়নি। অপর কাউকে ঔপনিবেশিক শাসকের রোষানলে পড়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতে হয়নি। কেননা তাঁর আগে কেউ রচনায়- বন্দনায় গণজোয়ার বইয়ে দেননি।

নজরুলের সুগভীর মানবপ্রেম ও স্বদেশপ্রেমই তাঁকে বিপ্লবী করেছে। প্রিয় স্বদেশভূমি ও স্বদেশবাসীকে পরাধীনতার অপমান থেকে মুক্ত করার জন্য সমাজ থেকে সর্ব প্রকার অসাম্য-বৈষম্য, অন্যায়-অবিচার দূর করার জন্য বাংলা কাব্য-সাহিত্য সোচ্চার হয়ে ওঠেনি। এক্ষেত্রে নজরুল বিপ্লবী সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হন।

নজরুল কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেননি বরং সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা করেছেন। তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনা হৃদয়ের গভীরে গ্রথিত। তাই অহেতুক সংস্কারকে বিদ্রূপের কষাঘাত হেনেছেন। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সবাই সে আঘাতের শিকার হয়েছে। কেননা সংস্কৃতির বলয় ধর্ম অপেক্ষা অনেক বড়। ধর্ম সংস্কৃতির একটা শক্তিশালী অঙ্গ । তাই ধর্ম সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে না বরং সংস্কৃতিই ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। নজরুলের সাহিত্যেও একথার সত্যতা বর্তমান। 'প্যাক্ট', 'তৌবা', 'হিতে বিপরীত', 'দে গরুর গা ধুইয়ে' প্রভৃতি ব্যঙ্গ কবিতায় তাঁর অসাম্প্রদায়িক নিরপেক্ষ চরিত্রের পরিচয় সহজেই লাভ করা যায়। তাঁর কাব্যে হজরত মুহম্মদ (সঃ) যেমন সাম্যের আদর্শ প্রচারক রূপে উপস্থাপিত, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ অত্যাচার ও কংসরূপের অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা যোগাতে আবির্ভূত। তাঁর কবিতায় বুদ্ধ-খ্রিষ্টের সঙ্গে কনফুসিয়াস এবং চার্বাকের নামও মুদ্রিত। কৃষ্ণ-বুদ্ধ- খ্রিষ্ট- মুহম্মদকে একাসনে বসাবার ফলে তাঁর সাহিত্যে ধর্মীয় ঐতিহ্য বিপ্লবী তাৎপর্য লাভ করতে পেরেছে। প্রকৃতই অসাম্প্রদায়িক জীবন চর্চায় নজরুলের চেয়ে আর কোন সাহসী নাম নেই।

এদেশের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ এক ভাষায় যেমন কথা বলতে পারে তেমনি এক পাতে খেতেও পারবে এমন ভাবনা ভাবার সাহস নজরুল ইসলাম এদেশের মানুষকে যুগিয়েছেন। রাসকিন

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন, 'পৃথিবীতে ধর্ম অনেকগুলো, কিন্তু নৈতিকতা একটিই।' সেই নৈতিকতা হচ্ছে মানব কল্যাণ সাধন। নজরুল ধর্মের নৈতিক দিকই তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা প্রকাশের ক্ষেত্রে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি আন্তর্জাতিক। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও মানব ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। ধর্ম সম্পর্কে তিনি মহামিলনের গীত উচ্চারণ করেছেন। নজরুলের ধর্মবোধ আরো প্রগাঢ়, অন্তরের গভীরতম প্রদেশে বিরাজমান।

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাঁর যে অভিযাত্রা তা সমকালীন সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষিতে অসাধ্য সাধনের সামিল। এ সমাজে বহুকাল ধরে নারী তার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। উনিশ শতকে ইউরোপ থেকে যে নারী মুক্তির ডাক আসে, সেই ডাকের সাড়াতেই মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রমীলা চরিত্রে নারী মুক্তির স্পৃহা ঘোষিত হয়েছে। নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এই প্রথম বারের মত অনুভূত হয়। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'ও নারী স্বাধীনতার কথা উচচারিত হয়েছে। কবি হেমচন্দ্রও সমাজে নারীর অসহায় অবস্থার বিরুদ্ধে মাত্রাভেদে উচ্চারণ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথও নারীর প্রতি সমাজের অবহেলার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী চালনা করেছেন। কিন্তু সময়ের প্রয়োজনের তুলনায় তাঁর লেখার আবেদন যথেষ্ট ছিল না। নজরুল বুঝতে পারেন পুরুষশাসিত সমাজে রীতি-নীতির সবগুলো সূত্রই পুরুষের স্বার্থের অনুকূলে। বলা হয়ে থাকে যে, 'A social structure is an organized system of social relations.' কিন্তু নজরুলের সমাজ একথা থেকে বহুদূরে অবস্থিত। সেখানে সমাজের অপরিহার্য অংশ নারী সমাজের মধ্যে থেকেও যেন নেই। নজরুল তাই নারীর অধীনতার বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী কবি- লেখকদের চেয়ে অনেক বেশী সোচ্চার।

নিপীড়িত মানবতার দুঃখে সত্যেন্দ্রনাথ ব্যাকুল হয়েছিলেন। নজরুল তাঁর সাহিত্যকর্মে বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের জন্য যে বেদনাবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং নিপীড়ন, অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য যে প্রবল বিদ্রোহ ও বিপ্লবাকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন তা কোন বিশেষ দেশ-কাল- মানুষের জন্য নয়; সমগ্র জগৎ সম্পর্কে তা সমভাবে প্রযোজ্য। নজরুলের সাহিত্যে দুটো শ্রেণী স্পষ্টত বিদ্যমান— অত্যাচারী অসুন্দর এবং নিপীড়িত ও অধিকারবঞ্চিত। নজরুলের বিপ্লবী চেতনা তাঁর সুগভীর ও প্রত্যয়োজ্জ্বল মানবপ্রেমে গ্রথিত হওয়ার কারণে মানুষের সামাজিক, ধমীয় রাজনৈতিক প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেরই অসংগতি তাঁকে গভীরভাবে ভাবিত করেছে। তাই তাঁর বিপ্লব-বহ্নি কখনো মাতৃভূমির অধীনতার বিরুদ্ধে, কখনো বা বিস্তৃত আকারে সমগ্র মানবজাতির নির্যাতন ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে এবং যাবতীয় অসুন্দর ও অকল্যাণের বিরুদ্ধে নিরন্তর প্রজ্জ্বলিত ছিল। যার কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে এলে ইংরেজ সরকার তাঁর চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে চাইলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন মুজফ্ফর আহমদ প্রমুখ বন্ধুর পরামর্শে। নজরুলের পরবর্তী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যেও লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়।

অসহযোগ আন্দোলন ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের নিস্তরঙ্গ সমাজজীবনে অনুভূতির ঢেউ তোলে। হৃদয়ানুভূতির যে উদ্দাম ভাববন্যা সমাজজীবনে নেমে আসে সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে তাতে অবগাহন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে দেশের প্রয়োজন মেটাতে 'রণতূর্য' হাতে নিয়ে উল্কা বেগে বিপ্লবী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এগিয়ে আসেন। সত্যেন্দ্রনাথ যেখানে ভাবকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হলেন নজরুল সেখানে সফল হলেন। 'ভাব ও কাজ' শীর্ষক প্রবন্ধে নজরুল বলেছেনঃ

Dhaka University Institutional Repository

'ভাব'কে কার্যের দাসরূপে নিয়োগ করিতে না পারিলে ভাবের কোন সার্থকতাই থাকে না।'

বাস্তবিকই নজরুল ভাবকে তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রয়োগ করলেন সার্থকভাবেই।

পূর্বে এদেশের মানুষের জানা ছিল না যে সাহিত্য মানুষের মনকে এমন উদ্বোধিত করতে পারে। নজরুল বুঝিয়ে দিলেন সাহিত্যের ভেতর দিয়েও বিপ্লবের বাণী দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দেয়া যায়, কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনার অভিপ্রায়ে। নজরুল যুগমানসিকতাকে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। তাই যুগের চাহিদা অনুযায়ী এতদিন যে কথা বলার মত করে বলা হয়নি, নজরুল সেকথা সেভাবেই বললেন যুদ্ধোত্তর বিরুদ্ধ প্রতিবেশে দাঁড়িয়ে। ফিদেল কাস্ট্রো বলেছেন বিপ্লবীর কাছে 'প্রয়োজনীয় বস্তু হচ্ছে বিপ্লব; প্রয়োজনীয় জিনিস হচেছ বিপ্লবী উদ্দেশ্য, বিপ্লবী চিন্তা, বিপ্লবী লক্ষ্য, বিপ্লবী আবেগ ও বিপ্লবী গুণাবলী।' একথার সার্থক বাস্তবায়ন দেখা যায় নজরুলের সাহিত্যকর্মে এবং সাক্ষাৎ কর্মসূচী গ্রহণের মধ্যে।

নজরুল জন আকীর্ণ অর্থাৎ জনগণবাদী সাহিত্য রচনা করেছেন। পূর্ববর্তী সাহিত্যিকগণের বাণী যতটা তত্ত্বপূর্ণ ছিল, ঠিক তত পরিমাণে বাস্তবতা তার মধ্যে ছিল না। নজরুল অভিন্ন বাণীতে সাহিত্য রচনা করলেও তাঁর দৃষ্টি বাস্তব হওয়ার কারণে তাঁর রচনার ভঙ্গিও অভিনবত্ব লাভ করে। তিনি তাঁর প্রতিবাদী প্রত্যয়কে প্রকাশ করতে গিয়ে সর্বোচ্চ বলিষ্ঠ শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন। ফলে তাঁর বাণী তাঁর উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। অন্যান্যদের সাথে এখানে তাঁর স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্যযোগ্য।

বিপ্লবকে স্বাগত জানাতে গিয়ে নজরুল তাঁর সাহিত্যে বিপ্লবের আদর্শ এবং বীররসের সঞ্চার করেছেন বলেই মানুষের কাছে একটা উজ্জ্বল আদর্শরূপে প্রতিভাত হয়েছেন। তাই দেশবাসী শত অবমাননা অবহেলা নির্যাতনের মধ্যেও আত্মমর্যাদায় উদ্বুদ্ধ হতে পেরেছে। বাস্তবিকই রাজনৈতিক অধীনতা, ধর্মীয় হিংস্রতা, নারীর অধিকারহীনতা, অর্থনৈতিক সহ সর্ব প্রকার শোষণের ধৃষ্টতা, সমাজের অমানবিকতা ও কুসংস্কার— এর বিরুদ্ধে নজরুল সাহিত্যে বিপ্লবী চেতনা-সঞ্চারক অভিব্যক্তি প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আইয়ুব, সালাহউদ্দীন। ১৯৯৪। আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আউয়াল, আবু হেনা আবদুল। ১৪০৫। নজরুলের নাম-কবিতার পটভূমি ও অন্যান্য তথ্য। সাহিত্য পত্রিকা, বিয়াল্লিশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ঢাকা।

আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ। ১৯৯৬। বাঙলায় খিলাফত- অসহযোগ আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আলী, মোবাশ্বের। ১৯৬৯। নজরুল প্রতিভা, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

আচার্য, মিহির (সম্পাদিত)। ১৩৭৫। সুকান্তনামা, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা।

আহমদ, শাহাবুদ্দীন। ১৯৭৬। নজরুল-সাহিত্য বিচার, মুক্তধারা, ঢাকা।

আহমেদ, দবিরুদ্দীন। ১৩৭৪। নজরুল সাহিত্যের নব মূল্যায়ন, নাফিউদ্‌দীন, খুলনা।

ইসলাম, রফিকুল। ১৩৮৯। কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও কবিতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা।

ইসলাম, মুস্তাফা নূরউল (সম্পাদিত)। ১৯৯১। নজরুল ইসলামঃ নানা প্রসঙ্গ, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

ইসলাম, রফিকুল। ১৯৭২। নজরুল জীবনী, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ইব্রাহিম,নীলিমা। ১৯৮৭। বাঙালি-মানস ও বাংলা সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

ইসলাম, মুস্তাফা নূরউল (সম্পাদিত)। ১৯৬৯। নজরুল ইসলাম, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

কর, শিশির। ১৯৯২। নিষিদ্ধ নজরুল, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

কাদির, আবদুল (সম্পাদিত)। ১৯৯৩। নজরুল- রচনাবলী (প্রথম- চতুর্থ খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

গুপ্ত, সুশীলকুমার। ১৯৯৭। নজরুল-চরিতমানস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

ঘোষ, বিশ্বজিৎ। ১৯৯৩। নজরুলমানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

চক্রবর্ত্তী, গোপিকারঞ্জন। ২০০০। নজরুল সাহিত্যে সমাজচিন্তা, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

চৌধুরী, আমীর হোসেন। প্রকাশকাল নেই। নজরুল কাব্যে রাজনীতি, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ। ১৩৯৭। কাব্য-সঞ্চয়ন, দে বুক স্টোর, কলকাতা।

দাস, সজনীকান্ত (সম্পাদিত)। ১৩৬০। হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা।

দাশ, জীবনানন্দ। আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত)। ১৯৯৪। প্রকাশিত- অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র, অবসর, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

দাশগুপ্ত, শান্তিকুমার ও মুখটী হরিবন্ধু (সম্পাদিত)। ১৩৮১। রঙ্গলাল রচনাবলী, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা।

দীন মুহম্মদ, কাজী। ১৯৬৫। সাহিত্য- সম্ভার, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

দেব, আশুতোষ (সঙ্কলিত)। ১৯৭৫। ছাত্রবোধ অভিধান অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার সুবৃহৎ শব্দকোষ, দেব সাহিত্য- কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

ফজল, আবুল। ১৯৭১। বিদ্রোহী কবি নজরুল, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। ১৩৪৪। বঙ্গীয়শব্দকোষ, বিশ্বকোষ প্রেস, কলিকাতা।

বইঘর। ১৩৯০। সুকান্ত সমগ্র, বইঘর, চট্টগ্রাম।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। ১৯৯৪। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

বসু, মধুসূদন। ১৯৭৫। নজরুল-কাব্যপরিচয়, সাহিত্যশ্রী, কলিকাতা।

মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ(সম্পাদিত)। ১৩৭৯। নজরুল সমীক্ষণ, আনন্দ প্রকাশন, ঢাকা।

মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ। ১৯৭০। আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মাহমুদ, মজিদ। ১৯৯৭। নজরুল তৃতীয় বিশ্বের মুখপাত্র, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

মাহমুদ, অনীক। ১৯৯৫। আধুনিক বাংলা কাব্যে সাম্যবাদী চেতনা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মিত্র, অশোক কুমার। ১৯৬৯। নজরুল প্রতিভা পরিচিতি, বাণী ভবন, ঢাকা।

মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার। ১৯৯৮। নজরুল ইসলাম কবিমানস ও কবিতা, রত্নাবলী, কলকাতা।

মুজফ্ফর, আহমদ। ১৯৮৭। কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতিকথা, মুক্তধারা, ঢাকা।

মুন্নী, শাহ্নাজ। ১৯৯৭। নারী জাগরণ ও নজরুল- সাহিত্যে নারী, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

রহমান, আতাউর। ১৯৯৩। নজরুলঃ ঔপনিবেশিক সমাজে সংগ্রামী কবি, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

রহমান, আতাউর। ১৯৯৭। নজরুল কাব্যসমীক্ষা, শুভ্রা প্রকাশনী, ঢাকা।

শরীফ, আহমদ। ১৯৯০। একালে নজরুল, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

সুন্দরম্, কল্যাণ। ১৯৮৮। বাংলা সাহিত্যে বস্তুবাদের ক্রমবিকাশ, পাবলিসিটি প্রিন্টার্স, কলিকাতা।

সেন, সুকুমার। ১৯৯৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

হক, মুহম্মদ এনামুল ও লাহিড়ী, শিবপ্রসন্ন (সম্পাদিত)। ১৯৭৪। বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী,ঢাকা।

হক, মোজাম্মেল। ১৯৭৬। বৃটিশ-ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, বুক হাউস, ঢাকা।

হারুন-অর-রশীদ, মোঃ ।১৯৯৬। নজরুল সাহিত্যে ধর্ম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হায়াৎ, মামুদ ও জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (সম্পাদিত)। ১৯৯৯। তোমার সাম্রাজ্যে, যুবরাজ, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

হায়াৎ, মামুদ। ১৯৮৩। নজরুল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হোসেন, সৈয়দ আকরম। ১৯৮৫। বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হোসেন, মীর আবুল (সম্পাদিত)। ১৩৭৭। নজরুল- সাহিত্য, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

Shakespeare, William, 1974. HAMLET, Bedford Books of St. Martin's Press, Boston, New York.

The Encyclopedia Americana. Volume-23, 1927. Grolier Incorporated, Danbury.